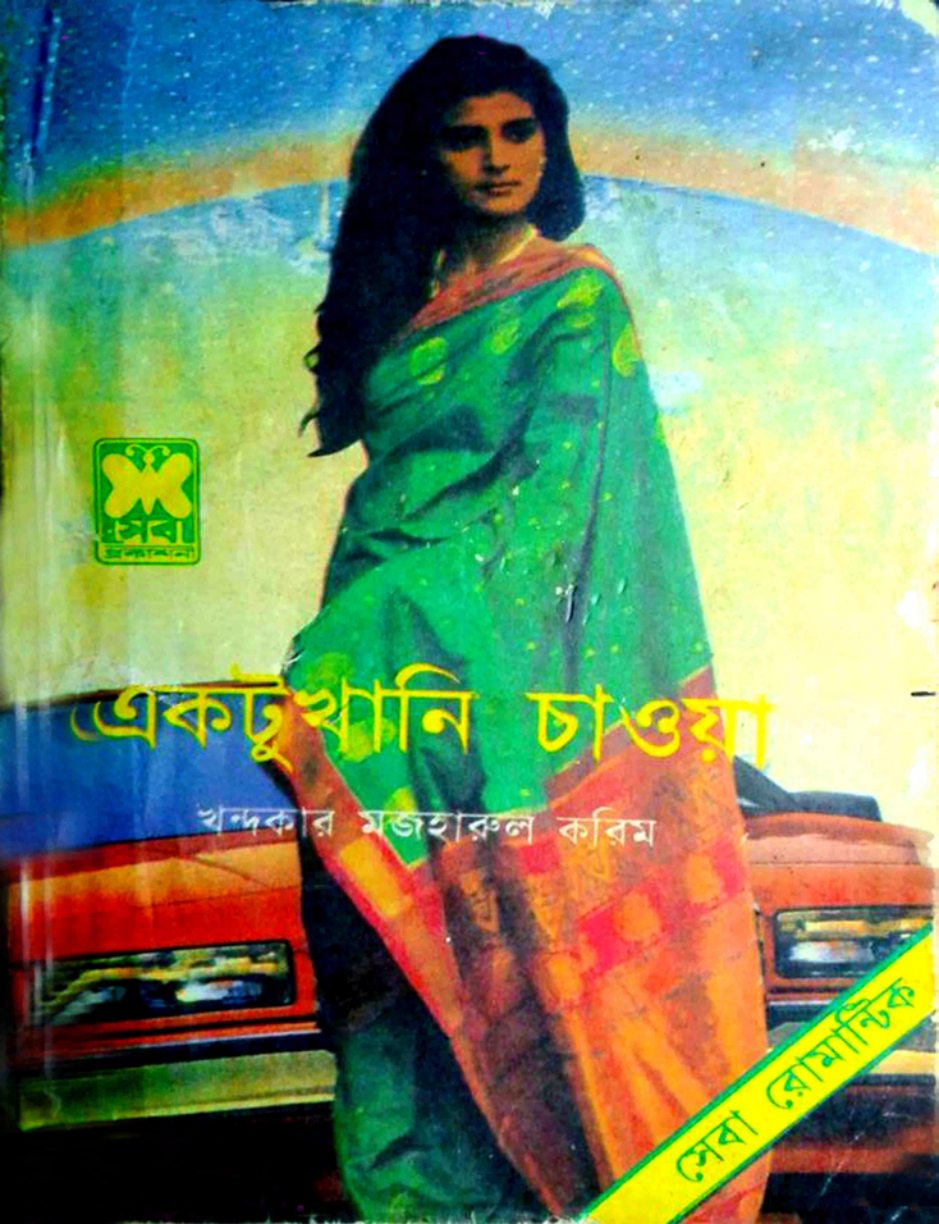
সেবা প্রকাশনী
একটুখানি চাওয়া
খন্দকার মজহারুল করিম
সেবা রোমান্টিক

সেবা রোমান্টিক

একটুখানি চাওয়া

খন্দকার মজহারুল করিম

বাবার মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই
এক নতুন বিপর্যয়ের আঘাতে কেঁপে ওঠে অসহায় সাদিয়া।
ঠিক এমন সময় সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা এক পুরুষ
এগিয়ে এল, বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত।
কে ওই লোক? কেন এত ঝুঁকি নিচ্ছে সে?
সাদিয়া বুঝতে পারে, জীবনের সব চাওয়া-পাওয়ার
পেছনে আছে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা।

রূপাও তো সামান্যই চেয়েছিল। ভেবেছিল, চাচার
স্নেহছায়ায় কাটিয়ে দেবে অনুঢ়া জীবনের দিনগুলো।
কিন্তু ওই চাওয়াটুকুর জন্যে আর কত মুল্য দেয়া যায়?

জটিলতা আর প্রেমের সঙ্গে এ-কাহিনীতে আছে অনেক
চাওয়া-পাওয়ার বুনন-
সে শুধু আপনার।

সেবা প্রকাশনা

সেবা রোমান্টিক সিরিজের ২৪তম কাহিনী

একটুখানি চাওয়া

সেবা প্রকাশনী থেকে রোমান্টিক উপন্যাস

খন্দকার মজহারুল করিম

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রণঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২

জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

EKTUKHANI CHAWA
By Khandker Mazharul Karim

বাইশ টাকা

একটুখানি চাওয়া

খন্দকার মজহারুল করিম

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

লেখক।

এক

সাদিয়া দূর থেকে দেখতে পেল, ওদের বাসার বারান্দায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কে ওই লোক? কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে? রাস্তার পাশের গেটটা খোলা। সাদিয়া আরও একটু এগিয়ে এসে দেখতে পেল, দূরের ধানখেতের দিকে উদাস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে আগন্তুক। মুখে খানিকটা বিরক্তির ভাব আছে, কিন্তু গাম্ভীর্যের কারণে সেটা তত স্পষ্ট নয়। লোকটা পাঁচ ফুট দশের কম নয়, ছ'ফুটও হতে পারে, অনুমান করলো সাদিয়া। চওড়া বুকের দু-পাশে দু-খানা শক্তিশালী হাত। লম্বা, ঋজু পায়ের ফাঁকে একটা ব্রিফকেস দেখা যায়। লোকটা কি নিরাপত্তাহীনতা নামের সেই বিশ্রী ব্যাধিতে ভোগে, সাদিয়া যার নাম দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ? কে জানে! এটা তো রেল স্টেশন কিংবা বাস টারমিনাল নয়! ব্রিফকেস চুরি-ছিনতাই হবার ভয় নেই। তবু কেন এত সতর্কতা?

আরও দু-পা কাছে এল সাদিয়া। ভালোভাবে তাকাল লোকটার দিকে। না, একেবারেই অপরিচিত। লোকটাও সম্ভবত ওদের চেনে না। নইলে ও এখানে দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে কেন?

বাড়িটা এখন ফাঁকা। এ-শহরের প্রায় সবাই জানে, ওদের কাউকে এখন বাসায় পাওয়া যাবে না। অফিস রুমের দরজায় প্লাস্টিকের নাম ফলকে লেখা আছেঃ 'জয়েনউদ্দীন কাজী। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।' কিন্তু এলাকার সবাই জানে যে কাজী সাহেব বেঁচে নেই। চল্লিশ দিন আগে হঠাৎ স্ট্রোকে মারা গেছেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস-কাম-রেসিডেন্স সরকারের সম্পত্তি। শেরপুর শহরে এই সরকারি পদটি শূন্য হয়েছে। হয়ত শিগগিরই নতুন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এসে দায়িত্বভার বুঝে নেবেন। সরকারি বাসাটা ছেড়ে দেবার জন্যে এরই মধ্যে নানান মহল থেকে চাপ আসছে। সাদিয়া জানে, বাসাটা ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু স্থির করতে পারেনি, কোথায় যাবে। আসলে ওর যাবার জায়গা নেই। বাবা ছাড়া ওর আর কেউ ছিল না। নীতিপরায়ণ মানুষেরা সাধারণত নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ হয়ে থাকেন। জয়েনউদ্দীন কাজী সাহেবও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তাঁর একমাত্র সন্তান সাদিয়াও ছোটকাল থেকে একা, অন্তর্মুখী স্বভাবের। বাবাকে হারিয়ে এই প্রথম উপলব্ধি করেছে, নিঃসঙ্গতা আসলে কত ভয়ঙ্কর! বুঝেছে, মানুষ একা থাকতে পারে না বলেই সে সমাজ গঠন করেছে।

সেদিন মাঝরাতে যখন হঠাৎ মারা যান জয়েনউদ্দীন সাহেব, তখন কয়েকজন প্রতিবেশীকে কাছে দেখতে পেয়েছিল সাদিয়া। ভেবেছিল, নতুন আশ্রয়ের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত ও তাদের নিবিড় সাহচর্য আর সাহায্য পাবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল, সময় যত যাচ্ছে, প্রতিবেশীদের ভিড়ও কমছে তত। চেহলামের দিনে কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে ওকেই কাজে নামতে হল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সরকারি বাসভবনে জায়গা খুবই কম। ওকে জেলা পরিষদের কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করতে হল। ডেকোরেটর, কুকদের সঙ্গে

কথা বলতে হল। চাল-ঘি-মশলা কেনার জন্যে ছুটতে হল বাজারে। খাসীর মাংস জোগাড় করার জন্যে দু'জন লোককে অনুরোধ করেছিল, তারা রাজিও হয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন সন্ধেবেলায় এসে তারা জানাল, বাজারে ভাল মাংস পাওয়া যাচ্ছে না। সাদিয়া দূরের গ্রাম থেকে কয়েকটা ছাগল কিনে নিয়ে এল অনেক কষ্টে।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা আসলে আনন্দের। ভুরিভোজে নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে পারেন না উপলক্ষটার পেছনে কারও জন্মের হর্ষ না মৃত্যুর শোক কাজ করছে! অনুষ্ঠানে প্রায় শ'দুই লোকের সমাগম হয়েছিল। এদের মধ্যে পাঁচ-ছ'জন মরহুম জয়েনউদ্দীনের নাম মুখে আনল। জয়েনউদ্দীনের মত মানুষ হয় না এবং এমন লোক দেশে আরও বিশ-পঁচিশজন থাকলে সমাজের চেহারাটা পাল্টে যেত, এতেও কারুর সন্দেহ নেই। তবে জয়েনউদ্দীন সাহেব নীতি-দুর্নীতি আর নিয়ম-অনিয়ম নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছেন, সেটাও নেহায়েৎ বোকামি আর মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। অত নিয়মনিষ্ঠ হলে এ-সমাজে বাঁচা যায় না···সবাই যেভাবে চলছে, আমাদেরও সেভাবে চলতে হবে···এইসব কথা উঠল। এরপর প্রসঙ্গ বদলাতে লাগল। সমাজনীতি, রাজনীতি, ভিডিও শপের সর্বশেষ আকর্ষণ, পরচর্চা, কিছুই বাদ গেল না। একজন সমাজসেবী মহিলা নিজের গোলাকার হাতব্যাগটি দেখিয়ে বান্ধবীকে বললেন, 'তোমার স্বামীর টাক আমার এই জিনিসটির মত। দিন দিন বেচারার মাথার অবস্থা খারাপ হচ্ছে। তা···তুমি সামলাতে পারছ তো?'

শ্রোতারা হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন।

সাদিয়া প্রাণপণে কান্না চেপে খাবার পরিবেশনে মন দিল। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'গোশ্তটা কোত্থেকে জোগাড় করেছ?'

তাঁর সঙ্গী বললেন, 'গোশ্‌তের দোকানের খবর জেনে আর কি করবে, মিয়া?. কিছু গোশ্‌ত তুলে পকেটে পুরে নাও। সাদিয়া মাই ডিয়ার মেয়ে, কিছু বলবে না।' আবার হাসির রোল উঠল।

মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নেই, সাদিয়া ভাবল। গোলমালটা আসলে নিয়মের মধ্যেই। যা সততই আনন্দের, উপভোগের, তাকে দুঃখ-শোকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার এ-নিয়মটাই খারাপ।

একসময় মরহুম জয়েনউদ্দীন কাজী সাহেবের চেহলামের অনুষ্ঠান শেষ হল। অতিথিরা ঢেকুর তুলতে তুলতে বিদায় নিলেন। বাবুর্চি আর অ্যাটেনডেন্টরা সাদিয়ার সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়াল।

'মেহমানদের খুশি কইরা বিদায় করছি, মেমসায়েব। অহন আমাদের খুশি করেন।'

সাদিয়া ওর সঞ্চয়ের সবটুকু অর্থ ব্যয় করে বাবার চেহলামের আয়োজন করেছে। হাতে বেশি টাকা অবশিষ্ট ছিল না। তবু ও সবাইকে খুশি করার ব্যবস্থা করল। তারপর বিষম ক্লান্ত শরীরে ফিরে এল বাসায়। বাসাটি ওদের নয়। শিগগিরই ছেড়ে দিতে হবে। কোথায় যাবে, কিভাবে যাবে, কিছুই ভাবেনি। এখন ভাবতেও চায় না। এখন একটু বিশ্রাম চাই ওর। সন্ধে পর্যন্ত একটানা ঘুমোবে।

ওর পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। অগ্রহায়ণ মাসের বিকেলে তার কপাল আর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অ্যাশ কালারের স্যুট পরে বাইরে বেরুনোর মত শীত পড়েনি এখনও। হয়ত বেশ অস্বস্তিতে আছে লোকটা।

সাদিয়া ছোটকাল থেকে ধর্মপ্রাণ বাবার কঠোর অনুশাসনে দিন কাটিয়েছে। অপরিচিত পুরুষের চোখের দিকে তাকানোর অভ্যেস হয়নি ওর। কিন্তু কেউ গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে তাকালে তার দিকে দৃষ্টি

না দিয়ে পারা যায় না। সাদিয়া দেখল, লোকটার চোখে মুগ্ধতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু এর কোন কারণ খুঁজে পেল না ও। তিনদিন ঘুম নেই। চোখের নিচে কালি পড়েছে। প্রসাধনী দূরের কথা, চুলে চিরুণি বোলানও হয়নি। একটা কালো শাড়ি আর সাদা ব্লাউজে নিশ্চয়ই ওকে রূপসী দেখাচ্ছে না! তাহলে লোকটার চোখে এমন ঘোর ঘনাচ্ছে কেন? নাকি, সবই সাদিয়ার মনের ভুল! কে জানে!

'আপনি···এ-বাসায় থাকেন?' গম্ভীর, ভরাট স্বরে প্রশ্ন করল আগন্তুক। তার আগে পকেট থেকে ডান হাতটা বার করে নীরবে সালাম দিল। সাদিয়াও হাত তুলে ওর সালামের উত্তর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে।

'হ্যাঁ।'

'ইয়ে···কাজী সাহেব নেই?'

সাদিয়া প্রায় নিঃশব্দে বলল, 'না।'

লোকটার স্বরে অসহিষ্ণুতার আভাস। 'কখন আসবেন?'

'পুরনো কাজী সাহেব আর কখনই আসবেন না। নতুন কাজী সাহেব কবে, কখন আসবেন, আমার জানা নেই।'

আগন্তুক বাঁ-হাতটাও পকেট থেকে বার করল। 'কি বলছেন এসব? আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। কাজী সাহেবের সঙ্গে জরুরী দরকার। আপনি বলছেন, নতুন কাজী দায়িত্ব নেবার আগেই পুরনো কাজী মানে জয়েনউদ্দীন সাহেব ট্র্যান্সফার হয়ে গেছেন! এসবের কি মানে হয়? গভর্নমেন্ট পেয়েছে কি? এভাবে দেশ চালান যায় নাকি?'

'আপনি খামোকা উত্তেজিত হচ্ছেন।'

'মোটেই খামোকা নয়। আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি প্রায় সোয়া একশ' মাইল দূর থেকে এসেছি। জয়েনউদ্দীন সাহেব এমন

হুট্ করে বদলি হয়ে···কোথায় গেছেন? ঢাকায়? ওনার বাড়ি তো ঢাকায়, তাই না? কিন্তু চার্জ বুঝিয়ে না দিয়ে···'

বাধা দিয়ে সাদিয়া বলল, 'চার্জ বুঝিয়ে দেয়ার সময় পাননি উনি। রাত একটায় স্ট্রোক হয়েছিল। একই সঙ্গে প্রথম আর শেষ স্ট্রোক।'

হাঁ হয়ে গেল আগন্তুকের মুখ। 'মা···মানে! উনি···বেঁচে নেই?'

যেন আজ বৃষ্টি হতে পারে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে সাদিয়া। গলা ধরে আসছে, তবু স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'না। আজ ওনার চেহলাম ছিল। সেসব ঝামেলা চুকে গেছে।'

'ও!'

বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রেখেছিল হাত দু-খানা। কখন বাঁধন আলগা হয়ে সেগুলো দু'পাশে ঝুলে পড়েছে, লোকটা জানে না। সাদিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতেও যেন কষ্ট হচ্ছে ওর।

মেঝের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে সে বলল, 'আপনি···'

'সাদিয়া কাজী। মরহুমের মেয়ে।'

লোকটি আবার পকেটে হাত ঢোকাল। বার করল সিগারেটের সোনালি প্যাকেট আর কাগজের ম্যাচ বাক্স। একটা সিগারেট ধরিয়ে নাক-মুখভর্তি ধোঁয়া ছাড়ল।

সাদিয়া বলল, 'অতএব···বুঝতেই পারছেন, কয়েকদিন পরে আসতে হচ্ছে আপনাকে।'

লোকটি চুপচাপ ধূমপান করতে লাগল। সাদিয়া হাতব্যাগ থেকে চাবি বার করে তালা খুলল। ঘরের ভিতরে পা দিয়ে বলল, 'আপনি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমি সত্যিই নিরুপায়। এখানে আর কেউ নেই। আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না।'

'ইয়ে···আমি কি একটু বসতে পারি?' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে এল লোকটি। 'এক গ্লাস পানি খাব।'

তৃষ্ণার্ত মানুষের ব্যাপারে সবাই দুর্বল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাদিয়া দরজাটা ভাল করে খুলল। সোফার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'বসুন।'

সাদিয়া রান্নাঘরে অনেকগুলো টিনের কৌটো হাতড়ে কয়েকটা বিস্কুট খুঁজে পেল। এক গ্লাস পানি আর তশতরিতে বিস্কুট সাজিয়ে ও যখন ড্রইংরুমে ফিরে এল, লোকটি তখন দেয়ালে ঝোলান কাবাঘরের বিরাট পেইন্টিং-এর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পেইন্টিং-এর নিচের অংশে লেখা পংক্তিগুলো আওড়াচ্ছে বিড়বিড় করেঃ 'হে মানুষ···তোমার জন্যে শেষ পর্যন্ত শুধু তা-ই থাকবে যা তুমি নিজের চেষ্টায় অর্জন করেছ।'

'পানি।'

'সাদিয়ার কথা শুনে ফিরে তাকালো লোকটি। 'আমার নাম মাহমুদ খান। ঢাকায় বাড়ি।'

সাদিয়া কথা বলল না। লোকটার পরিচয় সম্পর্কে ওর কোন আগ্রহ নেই।

'বাবার কাছে কেন এসেছিলেন?'

সামান্য হাসি ফুটলো মাহমুদ খানের মুখে। 'সে অনেক লম্বা কাহিনী।'

সাদিয়া বলল, 'আপত্তি থাকলে শুনতে চাই না। যখন সাহায্য করতে পারব না, তখন কথা বাড়িয়ে আপনার দেরি করিয়ে দিয়ে কি লাভ?'

মাহমুদ বলল, 'আপনি একেবারেই সাহায্য করতে পারবেন না, একটুখানি চাওয়া

এ-কথা মানতে রাজি নই। কিন্তু আপনার মানসিক অবস্থার বিবেচনা করে ভাবছি…আজ থাক না হয়।'

সাদিয়া মাহমুদের সামনে থেকে শূন্য গ্লাসটা সরিয়ে মুখোমুখি একটা সোফায় বসল। পায়ের ওপর পা তুলে হাত দুটো সেখানে রাখল একটা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে।

'আপনি বলুন।'

মাহমুদ খান কাবাঘরের ছবির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, 'আমার চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ খানের সঙ্গে আপনার বাবার পরিচয় ছিল।'

ভুরু কোঁচকাল সাদিয়া। 'আব্দুল্লাহ খান! নাহ্, এ-নামের কাউকে কখনও এখানে দেখিনি তো!'

'সে অনেকদিন আগের কথা। সতের বছরের কম নয়। আব্দুল্লাহ এখানে পালিয়ে এসেছিল। বিয়ে করেছিল রাশেদা বানু নামের এক মহিলাকে। তখন আপনি নিশ্চয়ই খুব ছোট! আপনি ওদের চিনতে পারবেন না, এটাই স্বাভাবিক।'

সাদিয়াকে চিন্তিত দেখায়। 'বিয়েটা কোথায় হয়েছিল?'

'এখানে। এই কাজী অফিসেই। আপনার বাবা ওদের বিয়ে পড়িয়েছিলেন। কয়েক বছর ওরা এখানেই ছিল।'

'তারপর?'

'এক ফুটফুটে মেয়ে হয় ওদের।'

সাদিয়ার চোখে কৌতূহল আর কৌতুকের মিলিত ঝিলিক। 'আপনি সেই মেয়েটির ঠিকানা খুঁজছেন?'

'না। মেয়েটি…মানে রূপা…আর ওর মা আমার কাছেই আছে। আমার কাছে…মানে…আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে।'

'আর ওর বাবা?'

'আব্দুল্লাহ বেঁচে নেই। বছর দেড়েক আগে মারা গেছে।'

সাদিয়ার মুখে কাতর শব্দ শোনা গেল। 'ওহ্! বেচারি আমার চেয়েও দুঃখী। অতি অল্প বয়সেই বাবাকে হারিয়েছে। তবে অন্য একদিক দিয়ে ওর ভাগ্য ভাল। আমার মত অকালে মা-কে হারায়নি। বাবা-মা দু'জনকেই হারান একটা মেয়ের জন্যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তা আপনাকে...'

সাদিয়া কথা শেষ করতে পারল না, গলা আটকে এল। মাহমুদ তাড়াতাড়ি বলল, 'কিন্তু মায়ের অস্তিত্ব ওর সৌভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য।'

'তার মানে?'

'আব্দুল্লাহ ঝোঁকের মাথায় যে-মহিলাকে বিয়ে করেছিল, সে আমাদের গোটা পরিবারের জন্যেই একটা সমস্যা। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বড় কষ্টে কাটিয়েছে ও। রাশেদার অনেক দোষের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ওর লোভ। কোন অগ্নিকাণ্ড দেখেছেন কখনও?'

সাদিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর অর্থটা বুঝতে পেরে বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের এই বাড়িতেই একবার আগুন লেগেছিল। দেখেছি। ভয়ঙ্কর সে-দৃশ্য! ভোলা যায় না।'

'আগুনের লকলকে শিখাগুলোর কথা ভাবুন। রাশেদার লোভ ওই শিখাগুলোর মতই। গোটা পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট করেছে সে-আগুন। আব্দুল্লাহ মরে বেঁচে গেছে। আমরা বেঁচে থেকে মরেছি। রূপাকে লেখাপড়া শিখতে দেবে না রাশেদা। সে অতটুকু মেয়েকে নিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চায়। রূপাকে সে একটা বাজে পেশায় ঢুকিয়ে দেবে। তারপর ওর আয়ের ওপর জীবিকা নির্বাহ করবে।'

সাদিয়া শিউরে উঠল। 'বলেন কি!'

মাহমুদ বলল, 'তার ধারণা, আমাদের কাছে থাকলে রূপা মা-কে ভুলে যাবে। ও লেখাপড়া শিখবে। চোখ খুলে যাবে ওর। হয়ত মা-কে অস্বীকার করবে। রাশেদা এ-সম্ভাবনার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। রূপাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্যে একটা নোংরা পথ খুঁজে বার করেছে। এত নোংরা যে আপনি সে-কথা বিশ্বাস করবেন না।'

সাদিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রূপার গল্প ওকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে।

মাহমুদ বলল, 'রাশেদা যখন বুঝতে পেরেছে, রূপার ওপর আমাদের দাবি অস্বীকার করার ক্ষমতা ওর নেই, তখন ওই অদ্ভুত পথ ধরে ও। ঘোষণা করে, রূপা আমাদের বংশের কেউ নয়।'

বিষম চমকে ওঠে সাদিয়া। 'তার মানে!'

'আব্দুল্লাহ খানের সঙ্গে নাকি ওর বিয়েই হয়নি। রূপার পরিচয়ের সমস্যা এড়ানর জন্যেই নাকি বিয়ের কথা প্রচার করা হয়েছিল।'

'সে কি? কোন মা এমন কাজ করতে পারে?'

মাহমুদ অনেকক্ষণ নীরব রইল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'নিজেদের চোখের সামনে না ঘটলে আমরাও এ-কথা বিশ্বাস করতাম না। আসলে ফ্যাক্ট ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, যা রূপকথা কিংবা উপন্যাসকে হার মানায়।'

সাদিয়া মেঝের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, 'রূপকথা কিংবা উপন্যাস—যা-ই বলুন, সব এসেছে জীবন থেকে। জীবনের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-কল্পনার নতুন নতুন বিন্যাসেরই নাম রূপকথা কিংবা উপন্যাস। মিথগুলোও তা-ই। ভেবে দেখুন, মানুষের কথা বলা আর

পাখির ওড়ার মধ্যে কোন গল্প নেই। মানুষের রূপকথায় তাই ওই কাজকর্মগুলোকে একটু অদলবদল করা হয়। তাই রূপকথায় মানুষ ওড়ে আর পাখি কথা বলে। কোথাও নতুন কিছু নেই।'

মাহমুদ মুগ্ধ বিস্ময়ে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। কথাগুলো ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। কাজী সাহেবের মেয়েটি গভীর জ্ঞান রাখে জীবন সম্পর্কে। একটা কথা বলার জন্যে মাহমুদ মুখ খুলেছে, এমন সময় বাইরে কয়েকজন লোকের চাপা হাসি আর দৌড়-ঝাঁপের শব্দ শোনা গেল। সাদিয়া এক ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা তুলে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল অপসৃয়মান ছায়াগুলোর দিকে। আবার নীরবতা নেমে এল। সাদিয়া ফিরে এসে সামনের সোফায় বসতেই মাহমুদ বলল, 'ওরা কারা? কি করছিল ওখানে?'

সাদিয়ার চোখে বেদনার ছায়া ঘনাল। 'ওসব জিজ্ঞেস করবেন না। ওগুলো আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দুর্দশা। রূপার কথা বলুন। ওর মতামত কি?'

'রূপা আমার প্রতি অসম্ভব অনুরক্ত। আমারই কোলে-পিঠে ও মানুষ হয়েছে, বলা চলে। ওর বাবা যখন বেঁচে ছিল, তখনও বেশির ভাগ সময় থাকত আমার কাছে। আমাকেই "বাবা" বলে ডাকত। এখন ও বড় হয়েছে। সরাসরি "বাবা" বলতে লজ্জা পায়, তাই "ছোট আব্বা" বলে ডাকে।'

'ছোট আব্বা! বাহ্! দারুণ তো!'

সাদিয়ার মুখ থেকে বেদনার কালিমা মুছে গেছে যেন। হঠাৎ ওকে সুখী দেখাচ্ছে। মানুষকে নির্মল আনন্দ দেয়ার কাজটা সবসময় তেমন কঠিন নয়, ভাবল মাহমুদ। কিংবা, কে জানে, কিছু কিছু মানুষ হয়ত সহজেই আনন্দ পেতে জানে।

'কিন্তু সমস্যা হল রাশেদাকে নিয়ে। রাশেদা একটুও পছন্দ করে না ব্যাপারটা। ও সবসময় চেয়েছে, রূপা আমাকে ঘৃণা করুক, দূরে থাক। রূপাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পরিকল্পনা আছে ওর। ও জানে, রূপা যদি আমার কাছে থাকে, তবে ওর সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।'

'তারপর?'

'প্রথমে রাশেদা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। যখন দেখেছে, ওতে কাজ হবে না, তখন মামলা ঠুকেছে। শুনানি হয়েছে আদালতে। রাশেদা পরিষ্কারভাবে বলেছে, আব্দুল্লাহ'র সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি। তাই রূপার ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। কোনভাবেই রূপাকে আটকে রাখতে পারি না আমরা।'

দ্বিধার সঙ্গে সাদিয়া বলল, 'কথাটা নিশ্চয়ই মিথ্যে!'

মাহমুদ টাইয়ের নট ঢিলে করে বলল, 'সর্বৈব মিথ্যে।'

'আদালত কি বলল?'

'আদালত এখনও রায় দেয়নি। দুটো শর্ত পালন করার দায়িত্ব পড়েছে আমার কাঁধে। প্রমাণ করতে হবে, আব্দুল্লাহ'র সঙ্গে রাশেদার বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় শর্ত...'

কথাটা শেষ না করেই উঠে দাঁড়াল মাহমুদ। 'দ্বিতীয় শর্তের কথা থাক, মিস সাদিয়া। ওটা এখন জরুরী কিছু নয়। প্রথমটার ব্যাপারে সাহায্যের জন্যেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি।'

থোকা থোকা অন্ধকার জমেছে ঘরের ভিতর। এরকম অন্ধকার বিষণ্ন করে তোলে মনটা। সাদিয়া সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মাহমুদের মন থেকে বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল এক মুহূর্তেই।

'তাহলে রাশেদা আর আব্দুল্লাহ খানের বিয়ের প্রমাণ খুঁজতে এসেছেন আপনি!'

'দ্যাট্‌স্ রাইট।'

সাদিয়া পাশের ঘরে চলে গেল। সুইচ টেপার শব্দ শুনল মাহমুদ। আবার পায়ের শব্দ। আবার আলো জ্বলল অন্য একটা ঘরে। সাদিয়া ঘুরে ঘুরে অন্ধকার তাড়াচ্ছে। ব্যাপারটা বেশ মজার লাগছে। এক রূপসী মেয়ে বাতিওয়ালার মত ছুটছে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। দূর করছে ভরা সাঁঝের অন্ধকার। চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আলোর হাসি। কিন্তু তারপরই মাহমুদের মনে খটকা লাগে।

সাদিয়া ফিরে আসতেই ও বলল, 'বাড়িতে অন্য কেউ নেই?'

ম্লান মুখে সাদিয়া বলল, 'না। আর একজনই মাত্র ছিলেন। আমার বাবা।'

'ও!' ভারাক্রান্ত গলায় বলল মাহমুদ, 'তবে তো আর আপনাকে বিরক্ত করা উচিত নয়। আজ চলি। কাল সকালে আসব। সতের বছর আগের কাগজপত্র খুঁজে বার করতে সত্যিই আপনার কষ্ট হবে। তবু...'

'সতের বছর!' ভাবতে চেষ্টা করল সাদিয়া। 'আমার তো মনে হয় কোনদিনই ওই সময়ের কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

মাহমুদের মুখ শুকিয়ে গেল। 'তার মানে!'

'বছর দশেক আগে একবার আগুন লেগেছিল এ-বাড়িতে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল অফিস রুমের। বাবার মোটা মোটা খাতাপত্র, ফাইল, আসবাব...সবকিছু পুড়ে যায়। আধপোড়া জিনিসগুলো কয়েকটা ট্রাঙ্কে পুরে তুলে রাখা হয়েছে রান্নাঘরের বক্স-এ।'

একটুখানি আশার আলো দেখতে পাচ্ছে মাহমুদ। 'একটু কষ্ট করবেন আমার জন্যে? কাল ট্রাঙ্কগুলো খুলে, খুঁজে দেখবেন? যদিই পাওয়া যায়!'

সাদিয়া একটু ভাবল। 'বেশ, আসুন কাল সকালে।'

'জানি, আপনার মন ভাল নেই। এ-সময় ব্যাপারটা আপনার ওপর অত্যাচারের সামিল হবে। কিন্তু···আমি সুদূর ঢাকা থেকে ছুটে এসেছি শুধু এই কাজের জন্যে। মামলায় জিততে না পারলে রূপা বাধ্য হবে আমাদের ছেড়ে ওর মায়ের সঙ্গে চলে যেতে। তাছাড়া···আমরা এত বিবেচনাবান মানুষ থাকতে একজন অবিবেচক মানুষ সবাইকে বোকা বানাবে, মিথ্যের জয় হবে, এটাও মেনে নেয়া যায় না, মিস সাদিয়া। চলি, কেমন? কাল আসব।'

মাহমুদ দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে চুরমার হল ড্রইং রুমের জানালার কাচ। বাইরে বেরিয়ে মাহমুদ দেখল, বারান্দা ভরে আছে কাচের টুকরোয়। একটা আধলা ইটও পাওয়া গেল। রাস্তা থেকে ছোঁড়া হয়েছে ওটা।

মাহমুদ ফিরে তাকাল। দরজায় দাঁড়িয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে সাদিয়া। বোঝা যায়, এসব উৎপাত সহ্য করার অভ্যেস হয়ে গেছে ওর। মাহমুদ ইটের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল।

গেটের কাছে পৌঁছে দেখল, দেয়ালের ওধারে অন্ধকারে শরীর লুকিয়ে বসে আছে কয়েকটা ছেলে। মাহমুদ গেটের কাছ থেকে সরে এল। পা বাড়াল সোজা দেয়ালের দিকে। এক লাফে উঠে পড়ল পাঁচ ফুট উঁচু দেয়ালের ওপর। তারপর চোখের পলকে নেমে গেল ওধারে—ড্রেনের পাশে।

বখাটে ছেলেদের দলটা এই আকস্মিক ঘটনায় হতচকিত হয়ে দুপদাপ শব্দে পালাল। ধরা পড়ল শুধু একজন। মাহমুদ সেই রোগা, জীর্ণ কাপড়-পরা ছেলেটার কাঁধ আঁকড়ে ধরল। বাজখাঁই গলায় বলল, 'কি করছিলে এখানে?'

'কিছু না।'

'এই ইটটা কে ছুঁড়েছে?'

'আমি না।'

কড়া ধমক দিয়ে মাহমুদ বলল, 'ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। দলবলের ভিতর তুমিও ছিলে। নিশ্চয়ই জান, ইটটা কে ছুঁড়েছে! যদি তার নাম না বল, ধরে নেব, তুমিই ছুঁড়েছ। তারপর এই অপকর্মের কি শাস্তি তোমাকে দেব, জান?'

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মাহমুদ বলল, 'এই ইট তোমার মাথায় ভাঙব।'

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার গায়ে হাত দিলে···ফল ভাল হবে না।···ওরা···আপনাকে ছেড়ে দেবে না।'

'ওদেরও মাথায় একটা করে আস্ত ইট ভাঙব আমি।'

'কে আপনি!'

'আমার পরিচয় নেবার দায়িত্ব তোমার নয়। ওটা পুলিসের কাজ। আমার কোন কাজে যদি তোমার সন্দেহ হয়, থানায় যাও। দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে আছ কেন? জানালায় ইট ছোঁড়ারই বা কারণ কি?'

'কাজী সাহেবের মেয়েটি ভাল নয়।'

'হতে পারে। কিন্তু তোমরা ওর চেয়েও খারাপ। কাজী সাহেবের মেয়ে তোমাদের কি ক্ষতি করেছে, জানি না। কিন্তু তোমাদের অসভ্যতার তুলনা হয় না। বনমানুষেরাও তোমাদের মত নোংরা আচরণ করে না। আজ কাজী সাহেবের চেহলাম হয়েছে। তাঁর মেয়েটি অসহায়। তোমাদের উচিত ছিল ওকে পাহারা দেয়া, সঙ্গ দেয়া।'

ছেলেটা এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। লাল চোখে তাকাল মাহমুদের দিকে। মাহমুদ বলল, 'যাও, এবারের মত তোমাকে ছেড়ে দিলাম। বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে জানিয়ে দিও, ওদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।'

ছেলেটা সাহস ফিরে পেয়েছে। বলল, 'এটা···আমাদের পাড়া।'

'খুব ভাল কথা। তাই বলে পাড়ার সবকিছুর মাথা কিনে নাওনি তোমরা। যদি ভাল চাও, তো তাড়াতাড়ি কেটে পড়।'

ছেলেটা জ্বলন্ত চোখে একবার মাহমুদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। মাহমুদ পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখন নিঃশব্দ পায়ে সাদিয়া এসে ওর কাছে দাঁড়িয়েছে, ও জানে না।

'কাজটা···ভাল করলেন না, মাহমুদ খান সাহেব।'

'কেন, কি করবে ওরা?'

'অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে।'

'তার জন্যে আপনিই বেশি দায়ী। হয়ত আপনার মরহুম আব্বাজানও কিছুটা দায়ী ছিলেন।'

সাদিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'অত্যাচার সহ্য করাটাও সমান অন্যায়—নিশ্চয়ই মানেন!'

'পানিতে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব বুদ্ধির কাজ নয়।'

মাহমুদ হাসল। 'কুমির দশবার কামড়াতে পারে। কিন্তু কুমিরের গায়েও এক-আধবার দাঁত বসান উচিত। তাহলে আর কুমিরের ভয়ে সবাইকে তটস্থ থাকতে হত না।'

সাদিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনি তো দাঁত বসিয়েছেন। কিন্তু এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে আমাকে!'

'মোটে একটা রাত, মিস সাদিয়া। ভালভাবে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাতে যান। আমি খুব কাছেই আছি। ভয় পাবেন না।'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল মাহমুদ। কয়েক মিনিট পর সাদিয়া আবিষ্কার করে, ও দুনিয়ার সবকিছু ভুলে লোকটার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

দুই

চাবিগুলো খুঁজে সারা হল সাদিয়া। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। গোছাটা অনেকবার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে ও। জয়েনউদ্দীন সাহেব প্রায়ই বলতেন, 'সাবধানে রাখিস, সাদিয়া, চাবিগুলোর ডুপ্লিকেট নেই। হারিয়ে গেলে ভারী বিপদ হবে।'

বাসার সব চাবিই সাদিয়ার কাছে থাকে। ছোটকাল থেকে ও-ই আগলে রেখেছে জয়েনউদ্দীন সাহেবের সংসার। ওঁর অফিসের অনেক কাজ করে সাদিয়া। আধপোড়া রেজিস্টার বইগুলো স্টীলের ট্রাঙ্কে তুলে তালা লাগিয়েছিল ও নিজেই। জয়েনউদ্দীন সাহেবের কখনও প্রয়োজন হয়নি ওইসব ট্রাঙ্ক খোলার। শুধু মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতেন সাদিয়াকে, 'চাবিগুলো যত্নে রেখেছিস তো?'

সাদিয়া যত্নেই রেখেছে সবকিছু। একসঙ্গে রাখলে হারিয়ে যেতে পারে—এই ভয়ে ছোট ছোট গোছা করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রাখত একসময়। পরে দেখল, ওতে শুধুই সমস্যা বেড়ে যায়। তাই আবার একত্র করেছে গোছাগুলো। যতদূর মনে পড়ে, নিজের কামরার স্টীলের আলমারিতে রেখেছিল সেটা। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কামরাটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। অন্যান্য কামরাও বাদ দেয়া

হল না। কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও।

বিষম বিব্রত মুখে সাদিয়া মাহমুদের দিকে তাকায়। মাহমুদ নিজেও বিচলিত বোধ করছে।

'ইয়ে···এক কাজ করলে কেমন হয়, মিস সাদিয়া? বাজার থেকে একজন তালাওয়ালাকে ডেকে আনি।'

'তাতে আপাতত সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু চাবিগুলো যে আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে! ওর ভিতরে সরকারের আমানত। চাবি যদি বেহাত হয়ে যায়, তবে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ? তাছাড়া বাবার জায়গায় যিনি আসবেন, তিনি হয়ত ডুপ্লিকেট চাবি নিতে রাজি হবেন না। কারণ ওইসব রেকর্ডপত্রের দায়িত্ব তো তাঁর ওপরই বর্তাবে।'

'তাহলে অনুমতি দিন, আমিও আপনার সঙ্গে হাত লাগাই। আমার তাগিদের ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!'

প্রস্তাবটা মেনে নিতে পারছে না সাদিয়া। কিন্তু কিছু করারও নেই। ওর সম্মতির অপেক্ষা না করেই খোঁজার কাজ শুরু করেছে লোকটা। সাদিয়া ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইল। মাহমুদ ভারী ম্যাট্রেস তুলে বিছানাটা পরীক্ষা করল। আলমারি, ওয়ার্ডরোব বারবার খুলে দেখল। রান্নাঘরের ক্রোকারিও বাদ দিল না।

ঘন্টাখানেক পর জয়েনউদ্দীন সাহেবের শোবার ঘরের ভেন্টিলেটরে পাখির বাসা ভেঙে যখন চাবির গোছাটা বার করল মাহমুদ, তখন ওর সারা শরীর ঘেমে একাকার। হাসিমুখে তোয়ালে নিয়ে এগিয়ে এল সাদিয়া।

'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব!'

'ধন্যবাদের ভাষা খুঁজে বেড়ানর কোন দরকার নেই।'

'এই তোয়ালেটা নিন।'

'আরও কাজ বাকি আছে। ওটা এখন রাখুন। রান্নাঘরের বক্স-এ উঠে স্টীলের ট্রাঙ্ক নামান খুব সহজ কাজ নয়। ওতেও অনেক ঘাম ঝরবে।'

সাদিয়া চেয়ারের ওপর তোয়ালে ঝুলিয়ে রেখে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। 'এবারের কাজটুকু আমাকেই করতে দিন।'

মাহমুদ রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে বক্স-এর অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করল।

'উঁহুঁ। একা পারবেন না, মিস সাদিয়া।'

সাদিয়া একটা উঁচু টুল এনে রাখল। টুলের পায়াগুলো সমান নয়। মাহমুদ ঝাঁকুনি দিয়ে দেখল, ওটা ভীষণ নড়ছে।

'পড়ে যাব না তো?'

সাদিয়া দু-হাতে দুটো পায়া শক্ত করে ধরল। 'আমার গায়ের জোর কম নয়। আস্থা রাখতে পারেন। এবার উঠে পড়ুন।'

মাহমুদ টুলের ওপর উঠল। ওঠার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর ঘষা লাগল সাদিয়ার দু'খানা নরম কাঁধের সঙ্গে। অদ্ভুত এক শিহরণ মুহূর্তের জন্যে দুর্বল করে দেয় মাহমুদকে। এমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। এখন ভাবনা বিলাসের অবকাশ নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় অচেনা মানুষদের সান্নিধ্যে ও এক জটিল কাজে এসেছে। কাজটা শেষ করেই চলে যেতে হবে ওকে। এসব দুর্বলতাকে কি এখন প্রশ্রয় দেয়া চলে?'

মাহমুদ টুলের ওপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা নত করে টুলের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে সাদিয়া। মাহমুদ নিজের গোড়ালির ওপর ওর নিঃশ্বাসের অস্তিত্ব অনুভব করল। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস।

সে-নিঃশ্বাসের তাপ ছড়িয়ে পড়ছে মাহমুদের শরীরে। মনকে ধমক দিয়ে লাভ হচ্ছে না। শিহরণ বেড়েই চলেছে। বয়স্ক মানুষেরা আজও বলেন, তেল আর আগুন একসঙ্গে রাখতে নেই। জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কথাটা আসলে ভেবে দেখার মত।

বক্স-এর ঢাকনা খুলে ফেলল মাহমুদ। ভিতরে অন্ধকার। কয়েকটা ইঁদুর আর আরশোলা ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। হয়ত ওরা জীবনে এই প্রথম আলো দেখেছে। জীবন বড় বিচিত্র; সবকিছুই অত্যাবশ্যকীয় মনে হয়। কিন্তু শুধু বেঁচে থাকার জন্যে এত সামগ্রীর কোন দরকার নেই।

বক্স-এ উঠে পড়ার আগে একবার নিচের দিকে তাকাল মাহমুদ। সাদিয়ার অপরূপ দেহবল্লরীর মূর্ত প্রমাণ এখন ওর শরীরের খুব কাছে। মাথা থেকে অন্ধকারের মত একরাশ চুল নেমেছে পিঠে। পিঠ অত চুলের জায়গা দিতে পারেনি। খানিকটা পিছলে নেমে গেছে কটির কাছে এসে। সত্যি মেয়েটি শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে। এতটুকুও নড়ছে না টুল।

হাতের ওপর ভর দিয়ে বক্স-এ উঠে পড়ল মাহমুদ। সাদিয়া টুল ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা তুলল।

'চমৎকার! মাসুদ রানাকে হারিয়ে দেবেন, মনে হচ্ছে।'

মাহমুদ হাসল। 'সোহানাই সেটা ভাল বলতে পারবে।'

কি বুঝল, কে জানে, সাদিয়া গম্ভীর হয়ে গেল। চাবির গোছা বাড়িয়ে ধরল একটা লম্বা খুন্তির সাহায্যে।

মাহমুদ বলল, 'বক্স-এর অন্ধকারকে আণ্ডার এস্টিমেট করছেন, মিস সাদিয়া। ট্রাঙ্কগুলো খুলতে পারলেও এখানে আমার কাজ হবে না। ওগুলো নিচে নামাতে হবে।'

সাদিয়া শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল।

'একগাছা দড়ি দিতে পারবেন?'

এ-কথার উত্তর না দিয়ে সাদিয়া বেরিয়ে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এল দড়ি নিয়ে। ছুঁড়ে দিল দড়ির গাছা বক্স-এর দিকে। ততক্ষণে মাহমুদ একটা ট্রাঙ্ক বক্স-এর ঢাকনার কাছে টেনে এনেছে। ট্রাঙ্কের দু-দিকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে ধীরে ধীরে ঝুলিয়ে দিল ও।

সাদিয়া ভয়ে ভয়ে নিচে এসে দাঁড়াল। মাহমুদ বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। আমার গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। দড়িগুলো কম মজবুত নয়। ট্রাঙ্কের মূল ভার আমাদের ওপরই থাকছে। আপনি শুধু সাবধানে ট্রাঙ্কটা টুলের ওপর বসিয়ে দিন।'

এভাবে তিনটে ট্রাঙ্ক নামান হল। সহজেই পা বাড়িয়ে ট্রাঙ্কের নাগাল পেল মাহমুদ। চোখের পলকে নেমে এল নিচে।

'আপনাদের বক্সটা খুব বিপজ্জনক। সহজেই চোর ঢুকতে পারে ওখান দিয়ে। ছোট জানালার শিকগুলোতে মরিচা ধরেছে। ঘুণে খেয়েছে কাঠের পাল্লা। তাছাড়া...' বলতে বলতে থেমে গেল মাহমুদ। সাদিয়া ওর কথা শুনছে না। শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সাদিয়া হঠাৎ লক্ষ করে, সবকিছু ভুলে ও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এক অপরিচিত পুরুষের পেশীর দিকে। কাজী সাহেবের কঠোর অনুশাসনে মানুষ হয়েছে ও। ওর জীবনে পুরুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা শুধু দুজনকে ঘিরে। একজন ওর বাবা অপরজন তাঁর এক শিষ্য। এছাড়া বাসায় এক কিশোর ভৃত্য ছিল। চমৎকার ছিল ছেলেটি। সারাদিন ভারবাহী পশুর মত খাটতে পারত। তবু হাসিটি যেন লেগেই থাকত মুখে। মা-হারা মনিবকন্যাটির ওপর তার মমতার অন্ত ছিল না। যেদিন সাদিয়ার মুখ ভার, সেদিন ছেলেটির খাটুনি বেড়ে যেত।

ভেবেই পেত না, কিভাবে ওই মুখে হাসি ফোটাবে সে। শুরু করত তার 'দেশের' গল্প। তার গ্রামের বাড়ি সুন্দরবনের খুব কাছে। বাঘ আর কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার অভ্যেস ওদের। সেসব কাহিনী শুনতে শুনতে সব দুঃখ ভুলে যেত সাদিয়া। ছেলেটি বছর তিনেক ছিল কাজী সাহেবের বাসায়। কিন্তু একদিন হঠাৎ কাজী সাহেবের মনে হল, ছেলেটি বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর মেয়েটিও কৈশোরের সীমানায় এসে পৌঁছেছে। আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না জয়েনউদ্দীন সাহেব। হাসিমুখে বললেন, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও, বাবা। তোমাকে আর রাখব না আমি।' সঙ্গী হারানর দুঃখের চেয়ে সাদিয়া বেশি কষ্ট পেয়েছিল তার ওপর বাবার বিশ্বাসের অভাব অনুভব করে। মানুষের বিশ্বাসের ব্যাপারটা খুব জটিল, ওই বয়সেই বুঝে ফেলেছে সাদিয়া। কত অসম্ভব, আজগুবি বিশ্বাস সারাজীবন আঁকড়ে রাখে মানুষ! অথচ যা বিশ্বাস করলে দোষ নেই, এমন অনেক কিছুতেই তার আপত্তি। শিষ্যটিকে ঘিরেও একদিন যখন বাবার অবিশ্বাস টের পেল সাদিয়া, তখন এক কঠিন পণে জীবনটাকে শৃঙ্খলিত করে ফেলল। কিন্তু সেসব কথা ও ভুলেও ভাবতে চায় না।

ডাইনিং রুমটা রান্নাঘরের ঠিক পাশেই। মাহমুদ ডাইনিং রুমের চেয়ার থেকে তোয়ালে নিয়ে ফিরে এল। হাত-মুখ মুছল। শার্টের দুটো বোতাম খুলে তোয়ালে চাপা দিল লোমশ বুকে। নেশাগ্রস্তের মত সেদিকে তাকিয়ে আছে সাদিয়া। অপরিচিত মানুষটার দিকে এভাবে তাকান উচিত হচ্ছে না বুঝেও চোখ ফেরাতে পারছে না। মানুষ মাঝে মাঝে নিজের কাছে বড় অসহায় হয়ে পড়ে।

'কই, চাবি দিন!'

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সাদিয়া। গ্যাস বার্নারের কাছে খুন্তি

রেখেছিল। কোথায় ওটা?

সাদিয়া যখন আশেপাশে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন মাহমুদেরই চোখে পড়ল সেই চাবির গোছা।

ট্রাঙ্ক খোলা হল। সাদিয়াও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। যেন যখের ধন বার করা হচ্ছে গোপন গুহার কুঠুরি থেকে। মোটা মোটা বাঁধাই-করা খাতা আর ফাইলে ভরে উঠল রান্নাঘরের মেঝে। একটিও আস্ত নয়; কিছু আধপোড়া, কিছুটা একেবারেই ছিন্নভিন্ন। তবু বোঝা গেল, ওগুলো ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ সালের ফাইল।

'আরও পিছিয়ে যেতে হবে। আরও আগের ফাইল চাই আমাদের,' ক্লান্ত সুরে বলল মাহমুদ। রান্নাঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ল। দেখল, হরিণীর মত ছুটে ডাইনিং রুমের দিকে গেল সাদিয়া।

মাহমুদ আটটা চাবির সাহায্যে চেষ্টা করার পর নবম বারে সফল হল দ্বিতীয় ট্রাঙ্কের তালা খুলতে। ডালাটা সবেমাত্র তুলেছে, এমন সময় বাধা পেল। এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সাদিয়া।

'পানিটা খেয়ে নিন। আপনার তেষ্টা পেয়েছে।'

মাথাটা সামান্য নুইয়ে পানির গ্লাস হাতে নিল মাহমুদ। 'প্রথমে মনে হয়েছিল; আপনার বুদ্ধি অন্য দশটা সুন্দরী মেয়ের মতই ভোঁতা।'

অসন্তুষ্ট স্বরে সাদিয়া বলল, 'এখন কি মনে হচ্ছে?'

'এখন বুঝতে পারছি, ভুল বুঝেছিলাম। জগতে সে-ই সত্যিকার বুদ্ধিমান, মানুষের মানবিক সমস্যাগুলোর ব্যাপারে যার বেশি বুদ্ধি খোলে।'

'বুঝতে পারলাম না।'

মাহমুদ হাসল। পানি খেয়ে গ্লাস ফেরত দিয়ে বলল, 'তবু বলব, আপনি বুদ্ধিমতী। আচ্ছা, অনুমান করে বলুন তো, এ-টাঙ্কে ১৯৭৩

সালের খাতাপত্র পাওয়া যাবে?'

একটু ভাবল সাদিয়া। মাহমুদ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সাদিয়া ভালভাবে আঁচল টেনে বুক ঢাকল।

'মনে হয় না। আরও একটা ট্রাঙ্ক আপনাকে খুলতে হবে।'

কিন্তু তৃতীয় ট্রাঙ্কেও খাতাটা পাওয়া গেল না। মাহমুদ আবার বক্স-এ উঠল। নিচে নামাল আরও দুটো ট্রাঙ্ক। এরপর প্রথম ট্রাঙ্ক খুলতেই ১৯৭৩ সালের রেজিস্টার বইয়ের এক তৃতীয়াংশ পাওয়া গেল।

সবকিছু ভুলে পাতা ওল্টাতে লাগল মাহমুদ। এতদিন পরও পোড়া গন্ধ কাটেনি। পাতার দোলায় বাতাসে যেটুকু আন্দোলন হচ্ছে, তাতেই ছড়িয়ে পড়ছে ওই গন্ধ। সাদিয়া হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়ে। দশ বছর আগের এক ভয়ঙ্কর রাতের কথা মনে পড়ে। হয়ত সেদিনই অপঘাত মৃত্যু ঘটত ম্যারেজ রেজিস্টার জয়েউদ্দীন কাজী আর তার সদ্য কিশোরী মেয়ের। সাদিয়া সেদিনের স্মৃতি মনে আনতে চায় না। ভুলে যেতে চায় মানুষের নিষ্ঠুরতা আর অমানবিক আচরণের কথা।

পুড়ে প্রায়-শেষ-হয়ে-যাওয়া খাতাটার একটা পৃষ্ঠায় মাহমুদের দৃষ্টি আটকে গেল। চোখ বুজে লম্বা শ্বাস নিল ও।

সাদিয়া বলল, 'পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। সবটুকু বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যেটুকু পড়তে পারছি...মনে হচ্ছে...প্রমাণ হিসেবে এ-ই যথেষ্ট।'

সাদিয়া পৃষ্ঠাটার দিকে তাকাল। আব্দুল্লাহ খানের নামের প্রায় সবটাই অক্ষত আছে। ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই তারিখে তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রাশেদা বেগম নামের এক মহিলার। রাশেদা বেগমের নাম পুরোটাই স্পষ্ট। ঠিকানা বোঝা যাচ্ছে না। বয়সের ঘরেও কালো

দাগ পড়েছে। শর্তাবলী, অন্যান্য তথ্য, সবই চলে গেছে আগুনের গ্রাসে। তবু যা পাওয়া গেছে, তা অনেক মূল্যবান তথ্য।

কষ্টসাধ্য যে কোন অর্জনই আনন্দের। মাহমুদের উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সাদিয়ার মনে হল, ও যেন বিশ্বজয় করেছে। অন্যের আনন্দ আর উল্লাসে অংশ নিতে পারাটাও কম আনন্দের নয়। সাদিয়া অভিভূত হল।

'আপনার কষ্ট সার্থক হয়েছে।'

মাহমুদ সকৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। 'শুধু আমার নয়, আপনার কষ্টও সার্থক। কাউকে অন্যের জন্যে এতটা কষ্ট করতে দেখা যায় না। আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় সাহায্যের জন্যে অনুরোধ করাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু···কি করব, বলুন? ঢাকা অনেক দূরের পথ। আবার এতদূর আসা···'

সাদিয়া কিছুটা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'আবার এলেই যে কাজটা হত, এমন কোন কথা নেই। দু-তিনদিনের মধ্যেই নতুন কাজী এ-অফিসের দায়িত্ব বুঝে নেবেন। এসব পুরনো, পোড়া, ছেঁড়া কাগজপত্র হয়ত তিনি ফেলেই দেবেন। যদি তা না করেন, হয়ত সরকারি মহাফেজখানায় জমা দেবেন। সেখান থেকে এসব রেকর্ড বার করা খুব কঠিন হত।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মাহমুদ। 'তা···যা বলেছেন! হয়ত কখনই সম্ভব হত না কাজটা। আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।'

হাসল সাদিয়া। 'কাউকে ঋণী করে রাখতে আমার ভাল লাগে না।'

'তা হলে বলুন, কিভাবে এ-ঋণ পরিশোধ করতে পারি।'

'আপনি ঋণী নন। পরিশোধের কথা আর তুলবেন না। আমার

বাবা সারাজীবন মানুষের উপকার করেছেন। কখনও কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করেননি। এখন কি করবেন, ভাবুন। পোড়া হোক আর ছেঁড়াই হোক, সরকারি খাতাটা তো আর আপনাকে দান করতে পারি না! ওগুলো যতদিন আমার কাছে থাকবে, ততদিন যখের ধনের মতই আগলে রাখব।'

মাথায় হাত রেখে চুলে বিলি কাটতে কাটতে মাহমুদ বলল, 'খাতাটা আধঘন্টার জন্যে আমার হাতে দিন।'

'তারপর?'

'বাজার বেশি দূরে নয়। সেখানে গিয়ে পৃষ্ঠাটার ফটোকপি করিয়ে নেব। তারপর ফেরত দেব আপনার "যখের ধন"। আইডিয়াটা আপনার পছন্দ হল?'

'হল।'

'বিশ্বাস করতে পারছেন আমাকে?'

সাদিয়া নীরবে ঘাড় নাড়ল।

মাহমুদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সর্বনাশ! সোয়া একটা বাজে। আপনার রান্নাবাড়ার সব কাজ পণ্ড করেছি। নিশ্চয়ই খিদে লেগেছে!'

সাদিয়া হাসল।

মাহমুদ অপলক চোখে ওই হাসিটির দিকে তাকিয়ে আছে। কোন কোন মানুষের হাসি কখনও ম্লান হয় না। শিশুর মতই সরল, নিষ্পাপ হাসিতে তারা অন্যের মন ভরিয়ে দেয়। সাদিয়ার হাসি ঠিক সে-রকম, ভাবল মাহমুদ।

'বললেন না, খিদে লেগেছে কিনা!'

'সত্যি কথাটাই বলি। ভয়ানক খিদে লেগেছে। কিন্তু উপায় কি?

আপনি বিদায় নিলে আমি রাঁধতে বসব। আজ একটু দেরি হবে খেতে, এর-বেশি আর কি?'

খাতাটা নামিয়ে রেখে মাহমুদ হাতজোড় করল। 'আমাকে আর অপরাধী করবেন না, প্লিজ। আজকের মত রান্নার কর্মসূচী স্থগিত রাখুন। ফটোকপি করার কাজটা সেরেই খাবারের দোকানে যাব। শেরপুর শহরের সবচেয়ে ভাল খাবার কিনে আনব। আপনি বড়জোর টেবিলে প্লেট-গ্লাস সাজিয়ে রাখতে পারেন। আজ দু'জনে একসঙ্গে খাব। আপত্তি করবেন না যেন।'

একটু ভাবল সাদিয়া। 'পেটে খিদে নিয়ে মুখে লজ্জা দেখানর কোন মানে হয় না। নইলে নিশ্চয়ই আপত্তি করতাম। তবু একটু দ্বিধা থেকে যাচ্ছে। পাড়ার মাস্তান চ্যাংড়াগুলোর কথা ভাবছি। ওরা টের পেলে ঢোল পিটিয়ে শহরে মিছিল বার করবে আমার চারিত্রিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেবে। দু-চারটে পটকাও ছুঁড়তে পারে এ-বাড়ি লক্ষ করে।'

দাঁতে দাঁত ঘষল মাহমুদ। 'অন্যায়, অত্যাচার সহ্য করাও একটা অপরাধ, মিস সাদিয়া। কোন-না-কোন সুযোগে এসবের প্রতিবাদ করতে হবে। অনেক তুচ্ছ কারণে আমাদের দেশে লোকে জীবন দেয়। অথচ এসব সত্যিকার কাজে কারও সাড়া পাওয়া যায় না। কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে! ঝুঁকি নিতে হবে। আর যারা আপনার নামে কুৎসা রটনার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, তাদের উপলক্ষের অভাব হবে না কোনদিন। কিছু পাওয়া না গেলেও তারা একটা অজুহাত তৈরি করে নেবে।'

'অত্যন্ত সত্যি কথা,' বিড়বিড় করে বলল সাদিয়া, 'কিন্তু আমি আমার কথা ভাবছি না। ভাবছি আপনার কথা। নিজের পারিবারিক

সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় এত দূরে এসে শেষে জড়িয়ে পড়বেন অন্যের ঝামেলার সঙ্গে—এটা তো আর ঠিক নয়।'

মাহমুদ হাসল। 'টেক ইট ইজী। সমস্যাকে আমি ভয় পাই না। আপনার সমস্যাটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু খালি পেটে ওসব আলোচনা ভাল লাগবে না। একটু অপেক্ষা করুন। এখনই ফিরে আসব।'

সাদিয়া বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গেট খুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে মাহমুদ। মনে হচ্ছে ওই লোক যেন কতদিনের চেনা! এ-পরিবারেরই একজন যেন ও! অনেক ঝড়-ঝাপটা এসেছে সাদিয়ার জীবনে। তাতে একটা লাভ হয়েছেঃ মানুষ চিনতে শিখেছে ও। ওই লোকের পরিচয় জানে না সাদিয়া। কিন্তু এটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে ও একজন ভাল মানুষ। কোন কপটতা নেই ওর মধ্যে। এর চেয়ে বেশি জানা আর বোঝার কিছু নেই। এ-জীবন এমনিতেই যথেষ্ট জটিল। অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে এসেছে সাদিয়া। নতুন করে কোন জটিলতার দিকে পা বাড়াবে না ও। মনকে আর ছেড়ে দেবে না, কোথাও হারিয়ে যেতে দেবে না তাকে।

জীবনটা অনেক বড়। অনেক দীর্ঘ এ-জীবনের চলার পথ। সে-পথে নানান সমস্যা আছে, আছে অনেক বিপদ! এসবের মাঝখানে মানুষ এগিয়ে আসবে মানুষের কাছে; পাশে দাঁড়াবে। পারস্পরিক সাহায্য আর সহযোগিতার বিনিময় হবে, তারপর শেষ হয়ে যাবে দু-দিনের মেলামেশা আর পরিচয়।

রাস্তার ওধারের দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে একটা ছেলে শিস দিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল সাদিয়া। বাসন-পত্র ধুয়ে পরিষ্কার করে

টেবিল সাজাল। বেশ কয়েকদিন পর টেবিলে দুটো প্লেট রাখতে পেরে মনে খুশির ছোঁয়া লেগেছে। নিঃসঙ্গতা খুব বাজে জিনিস। নৈঃসঙ্গ যার ভাল লাগে, সে অসামাজিক। মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে স্বাভাবিক গুণই তার মাঝে নেই।

কি ভেবে ডাইনিং রুম ছেড়ে পেছনের প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গেল সাদিয়া। খাওয়ার টেবিলে একগোছা ফুল চাই। চমৎকার দেখাবে। অনেকগুলো গাছ হাতড়ে সাদিয়া কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা আর জিনিয়া ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে রাখল। ফাঁকে ফাঁকে সাজিয়ে দিল রকমারি ক্রোটন্‌স্‌-এর পাতা।

একটা চেয়ারে বসে ফুলদানির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ ভিজিয়ে ফেলল সাদিয়া। বিড়বিড় করে বলল, 'বাবা, তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, জানি না। ফুল খুব ভালবাসতে তুমি। আর ভালবাসতে সুন্দর মনের মানুষদের। আমি তোমার স্মৃতির অমর্যাদা করতে চাই না।'

দরজায় শব্দ হল। সাদিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বেসিনে মুখ ধুল। দরজা খুলে দেখল, দু-হাতে দুই ঢাউস প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদ খান।

'আস্ত বাজারটাই তুলে এনেছেন দেখছি।'

মাহমুদ হাসল। ডাইনিং টেবিলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। প্যাকেটগুলো নামিয়ে রেখে বলল, 'এর বেশির ভাগ আমিই খাব। আপনাকে বেশি খাইয়ে পৃথিবীকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর শোভা থেকে বঞ্চিত করার মত অপরাধ করতে একটুও রাজি নই।'

মাহমুদের দিকে তাকিয়ে রইল সাদিয়া। চোখে এক অদ্ভুত চাহনি। তার মানে, 'ভারী স্পর্ধা তো আপনার!'

মাহমুদ বলল, 'আচ্ছা, বেশ। উইথড্র করে নিচ্ছি কথাটা। আপনি সবটাই খেয়ে কুমড়োপটাশ হতে পারেন। তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

হাসল সাদিয়া। 'ছুঁড়ে দেয়া তীর আর বলে ফেলা কথা একই। কোনটাই উইথড্র করা যায় না।'

লম্বা শ্বাস নিয়ে মাহমুদ বলল, 'আপনি সত্যিই হার্ড নাট। মেনে নিচ্ছি, কথা উইথড্র করা যায় না। কিন্তু বলে-ফেলা কথার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা যায়। কবির মত আপনার রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করার জন্যে এখন আমি...'

'থামুন। আপনার স্তুতি শুনে আমার পেট ভরবে না। প্যাকেট খুলুন।'

'তাতেও রাজি। আসুন।'

প্রচুর খাবার এনেছে মাহমুদ। পরাটা, খাসীর মাংস, মুরগির রোস্ট, সালাদ, দই, মিষ্টি, আর একছড়া কলা।

সাদিয়া হেসে বলল, 'যদি একজন সুপ্রতিবেশীও আমার কাছাকাছি থাকত, তাকে ডেকে আনতাম। এত খাবার এনেছেন যে নিজে খাওয়া দূরে থাক, আপনাকেও খেতে বলব না। আধপেটা খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে। কিন্তু ভরপেট খেয়ে কেউ সুস্থ থাকতে পারে না।'

মাহমুদ প্রসঙ্গটা হাতছাড়া করতে চায় না। 'আপনার প্রতিবেশীদের সমস্যাটা কি?'

'একটু অতীত থেকে শুরু করি। পাড়ার একদল মাস্তান গোছের ছেলে একদিন গভীর রাতে দরজায় দমাদম ঘা মারতে শুরু করল। "কাজী সাহেব, বাসায় আছেন?" বাবা বাইরে আলো জ্বেলে দরজা খুললেন।

"কি চাই তোমাদে..

ছেলেরা বলল, "একটা বিয়ে পড়ানর কাজ আছে। এখনই পড়াতে হবে।"

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, "রাত সাড়ে এগারটা বাজে। এটা কি বিয়ে পড়ানর সময়? কাল সকালে এস।"

ছেলেরা বাবার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। "আপত্তি করবেন না, কাজী সাহেব। আমরা চাই, এখনই হবে এ-বিয়ে। এটা গণদাবি। গণদাবির মুখে কত রাজা-বাদশা উড়ে যাচ্ছে! আপনি কোন্ ছার!"

"ভদ্রভাবে কথা বল।"

নেতা গোছের একটা ছেলে টেবিলে ঘুসি মেরে বলল, "ভদ্রতা শেখাবেন না। বিয়ে পড়ানর ব্যবস্থা করুন।"

বাবা কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "পাত্র-পাত্রী কোথায়?"

"এই যে...এখানেই আছে।"

ভিড়ের পেছনদিক থেকে এক তরুণ আর এক কিশোরীকে সামনে ঠেলে দেয়া হল। আমি পাশের ঘরের দরজার পর্দা তুলে সব দেখছি। পাত্রের বয়স উনিশ-কুড়ি বছরের বেশি হবে না। কনে একেবারেই বাচ্চা মেয়ে, খুব বেশি হলে পনেরয় পা দিয়েছে।

বাবা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। "অসম্ভব! ওদের বিয়ের বয়স হয়নি। কিছুতেই এ-বিয়ে পড়াতে পারব না আমি।"

ছেলেরা চিৎকার করতে শুরু করল, "বললেই হল? বিয়ে পড়াতেই হবে আপনাকে! এটা আমাদের প্রেস্টিজের ব্যাপার।"

"প্রেস্টিজের ব্যাপার মানে!"

"ওই ছেলে অন্য পাড়ার। আমাদের পাড়ায় এসে এখানকার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে! কত সাহস!"

"সে-তো ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার! তোমরা জোর করে ওদের বিয়ে দিতে চাও কেন?"

"প্রেস্টিজের কারণে। এটা ওদের শাস্তি।"

মেয়েটি ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বাবা স্নেহের সুরে বললেন, "তুমি কি এখন, এই অবস্থায় বিয়ে করতে রাজি?"

এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

বাবা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে একই প্রশ্ন করলেন। ছেলেটির মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। একবার বাবার দিকে আর একবার মাস্তানদের দিকে তাকাতে লাগল সে।

বাবা বললেন, "বুঝতে পেরেছি। এখন তোমরা যাও। পাত্র-পাত্রীকে আমার কাছে রেখে যাও। আমি ওদের বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেব।"

"তার মানে!" উত্তেজিত হয়ে একটা ছেলে রিভলভার বার করল। "আপনি ওদের বিয়ে পড়াবেন না?"

বাবার দু-চোখে এত রাগ, ঘৃণা আর সাহস আমি আর কখনও দেখিনি। উনি লম্বা লম্বা পা ফেলে রিভলভারওয়ালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। "গুলি করবে আমাকে? কর।"

ছেলেটি হতভম্ব হয়ে পড়ল। "সামনে থেকে সরে যান। নইলে সত্যি গুলি করব।"

বাবা হেসে বললেন, "আমিও তো তাই চাই! চালাও তোমার গুলি! আমার রক্তে তোমার প্রজন্মের অন্যায় ভেসে যাক। তোমাদের মত পশুদের ভয়ে ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজে মরার বদলে বুকে গুলি

খেয়ে মরাই ভাল।"

মাস্তানদের দলে দ্বিধা দেখা দিল। একদল ছেলেটাকে উস্কানি দিয়ে বলল, "দে ব্যাটাকে শেষ করে!" কিন্তু অন্যদল সাবধান করল তাকে। "অ্যাই, ছেড়ে দে। লক্ষণ ভাল না। কাজী সাহেবের কোন ক্ষতি হলে আমাদের সবাইকে ভুগতে হবে।"

এইসব বাদানুবাদের ভিতর একসময় পুলিস এসে আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলল। পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকরাই পুলিসে খবর দিয়েছিলেন। মাস্তানদের কয়েকজন পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। অন্য কয়েকজন ধরা পড়ল।

বাবা সে-যাত্রা রক্ষা পেলেন। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েই মাস্তানরা খুব নির্মম ভাবে শোধ নিল। আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল ওরা। আমরা শুধু প্রাণে বাঁচলাম। কিন্তু আমাদের যা-কিছু ছিল, সব গেল।'

খাওয়া ভুলে সাদিয়ার কথা শুনছিল মাহমুদ। ওর দু'চোখ জ্বলছে রাগে।

'এটা বিংশ শতাব্দীর কোন সভ্য সমাজের ঘটনা? বিশ্বাস হয় না।'

সাদিয়া হাসল। 'এর চেয়েও নৃশংস ঘটনা প্রত্যেকদিন ঘটছে। কে বলল, আমরা সভ্য সমাজের মানুষ? গুহা যুগের মানুষও এর চেয়ে সভ্য ছিল। ওই অসভ্য মাস্তানরা দিনের পর দিন অত্যাচার চালিয়েছে আমাদের ওপর।'

'কিন্তু আপনারা...'

কথা শেষ হল না। বজ্রপাতের মত ভয়ঙ্কর শব্দে কানে তালা লাগল যেন। জানালায় কাচ নেই। ধোঁয়া ঢুকে পড়ল ঘরে।

অস্ফুট স্বরে সাদিয়া বলল, 'বোমা! ওরা বোমা ছুঁড়েছে। আপনি পালিয়ে যান, প্লিজ। আমার ভাগ্যে যা আছে, হবে।'

মাহমুদের ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। এক লাফে ঘরের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ও। দশ–বার জন সশস্ত্র লোকের একটা দল ঘিরে ফেলেছে ওকে।

'তুমি কোন্ মাস্তান, বাবা?' প্রশ্ন করল একটা ছেলে।

মাহমুদ রুক্ষ গলায় বলল, 'তোমরা কি চাও?'

'আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলব না, চাঁদ। ওই সুন্দরী···কাজী সাহেবের বেটিকে ডেকে দাও। ওকে তুলে নিয়ে যাব আমরা।'

'তার আগে আমি তোমাদের পুঁতে ফেলব,' ধীরে ধীরে বলল মাহমুদ। নিজেই জানে না, এত সাহস কোথায় পেল ও।

তিন

একটু আগে যেসব নরাধমের গল্প শুনেছে, মাহমুদ তাদেরই মুখোমুখি হয়েছে এখন। সমাজের জীবনে দশ-বার বছর খুব দীর্ঘ সময় নয়। সেইসব চরিত্র এখনও অপরিবর্তিত; অভিন্ন তাদের চেহারা। শুধু কয়েকটি নাম বদলেছে, হয়ত আগের সেই পোশাকগুলো নেই। কিন্তু অন্য সবকিছু ঠিক তেমনই আছে।

ছেলেগুলো মাহমুদের অগ্নিমূর্তির সামনে থমকে দাঁড়াল। ঝাঁকড়া চুলওয়ালা যে ছেলেটা ওর ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছে, ওর রিভলভারে গুলি আছে কিনা সন্দেহ। মাহমুদ একবার ভাবল, খপ্ করে অস্ত্রটা কেড়ে নেবে। তারপর সিদ্ধান্ত বদলাল। অতখানি ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না।

'এই যে নয়া মাস্তান সাহেব' ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ছেলেটা বলল, 'বাড়ি কোথায় আপনার?'

'বাংলাদেশে।'

'কাজী সাহেবের বাড়িতে কি দরকার?'

'দ্যাট্স্ নান অভ ইউর বিজ্নেস্। ঝামেলা না করে মানে মানে একটুখানি চাওয়া

সরে পড়। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি; করতে চাই ও না। তোমরাও নিজেদের চরকায় তেল দাও। আমার ক্ষতি করার চেয়ে অন্য কাজে মন দিলে ফল ভাল হবে।'

জানালার শার্সির আড়ালে দাঁড়িয়ে সাদিয়া রুদ্ধশ্বাসে অমিততেজী লোকটার কথা শুনছে। ও জানে, মাহমুদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই। হিংস্র, কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেগুলো যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে, ও কিছুই করতে পারবে না। তবু কি সাহসে ওদের মুখোমুখি হয়েছে লোকটা!

অন্য দুটো ছেলে পেছন থেকে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। 'ঝামেলা আমরা করছি না। আপনিই করছেন। সরে যান। আমরা বাড়িটার দখল নেব। কাজী সাহেবের কন্যার ভবিষ্যৎ ঠিক করব আমরাই।'

'কে তোমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে? বাড়িটা সরকারের। নতুন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার সরকারি চিঠি এনে এখানে ঢুকবেন। তার হাতে বাড়ি আর অন্যসব সরকারি সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবেন মিস সাদিয়া কাজী। তারপর তিনি এখান থেকে যাবেন।'

হৈ-চৈ করে ওঠে ছেলেরা। 'আমাদের আইনের কথা শোনাবেন না। ওসব আমরা অনেক শুনেছি। আমরাই তো সরকার! আইন আমরাই তৈরি করি।'

'তবু আইন তোমাদের ছাড়বে না।'

'আপনি কি আমাদের আইনের ভয় দেখানর জন্যে এসেছেন?'

'না,' দ্বিধাহীন স্বরে মাহমুদ বলল, 'আমি একটা সরকারি কাজে এখানে এসেছি। সেটা সারা হলে চলে যাব। দশ বছর আগে এই সরকারি সম্পত্তিতে যারা আগুন লাগিয়েছিল, তাদের নাম-ধাম-পিতৃপরিচয় যোগাড় করেছি। রিপোর্ট আর ডকুমেন্ট্স্ ঢাকায় পাঠিয়ে

দিয়েছি। পুলিসকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ব্যবস্থা নেয়ার।'

'বাদ দিন ওসব বুজরুকি। পুলিসকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি,' দলনেতা বলল, 'পুলিস উল্টে আমাদের ভয় পায়।'

হো হো করে হাসলো মাহমুদ। 'ঢাকা থেকে স্পেশাল রিজার্ভ ফোর্স আসবে। পার তো লাল চোখ দেখিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিও।'

দলের ভিতর গুঞ্জন উঠল। মতপার্থক্য হয়ে উঠল আরও স্পষ্ট। নেতাদের একজন বলল, 'আগামীকাল সকাল পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে বাড়ি খালি করতে হবে। যান, কাজী সাহেবের মেয়েকে বলুন, সকাল দশটার মধ্যে আমরা সদলবলে চলে আসব। কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না।'

মাহমুদ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নেতাটি বলল, 'কোন চালাকির চেষ্টা করবেন না। কাজ সেরে আপনি বিদায় নিন। ওই সুন্দরীকে নিয়ে কোন "প্লে" করার ফল ভাল হবে না।'

আরও দুটো পটকা বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লাগল। দুপদাপ শব্দ তুলে চলে গেল মাস্তানদের দল।

'আপনার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। জানেন, ওরা আপনাকে খুন করতে পারত! কেউ বাধা দিতে আসত না!'

ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে পুরো এক গ্লাস পানি খেল মাহমুদ। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি জানি, মুখে যা-ই বলুক, একজন অচেনা লোককে অত সহজে খুন করার ঝুঁকি নেয় না কেউ।'

'কেন?' আয়ত চোখ তুলে বলল সাদিয়া। সে-চোখে শিশুর মতই সরল জিজ্ঞাসার চিহ্ন। লোকটার ওপর আস্থা বেড়ে গেছে ওর। এরকম জঙ্গী হানাদারের দলকে প্রতিহত করা খুব সহজ নয়।

মাহমুদ বলল, 'অজানা-অচেনা জিনিসের ব্যাপারে মানুষের ভয় থাকবেই। বিশেষ করে মাস্তানী আর সন্ত্রাস যাদের পেশা, তারা অত কাঁচা কাজ করে না। ওদের দুর্বলতাটা প্রথমেই ধরে ফেলেছি। সে-সুযোগটাই নিলাম।'

'ভয়ঙ্কর লোক আপনি! খুব ভয় পাচ্ছিলাম। অপরাধবোধেও ভুগছিলাম। ভাবছিলাম, আমার জন্যে বুঝি আপনিই প্রাণ খোয়াবেন।'

মাহমুদ অপলকে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। 'মানুষ অতি তুচ্ছ কারণে প্রাণ খোয়ায়। আমি না হয় একটা মহৎ কাজেই জীবন বাজি রাখি! মানুষের জীবন অনেক বড়। আরও বড় তার মর্যাদা, সম্ভ্রম।'

'বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি। সফলও হয়েছেন। কিন্তু তারপর? কাল সকালে তো ওরা আবার আসবে!'

'তার আগেই আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছব।'

চমকে ওঠে সাদিয়া। 'সিদ্ধান্ত মানে!'

মাহমুদ বলল, 'সত্যি কথাটা স্পষ্ট করে বলাই ভাল।'

'বেশ তো! বলুন না!'

'মাস্তানগুলোর আসল লক্ষ আপনি। যে-কোন উপায়ে ওরা আপনার ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজছে।'

মৃদু মাথা নেড়ে সাদিয়া বলল, 'জানি।'

'অতএব আপনার এখানে থাকা চলবে না। শুনলাম, যে-কোনদিন নতুন কাজী এসে পড়বেন। কিন্তু সে-অনিশ্চিত ব্যাপারের অপেক্ষায় থাকার কোনো মানে হয় না। নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।'

'নতুন কাজীর হাতে বাবা রেখে-যাওয়া সব জিনিস তুলে না দিয়ে আমি কোথাও যাচ্ছি না। বাবাকে কথা দিয়েছি আমি।'

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করল মাহমুদ। 'ইট্‌স্ ক্রেজি। জেনেশুনে বিপদ আঁকড়ে ধরার কি মানে হয়? আপনি বরং ভালোভাবে ভেবে দেখুন। এখনও সময় আছে।'

সাদিয়া দূরের ধানখেতের দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য গভীর, উজ্জ্বল ওর চোখ। গোটা খেতই যেন বিস্মিত হচ্ছে ওখানে। মাহমুদ সেই চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল। একটা উপমা দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু একটা গান কিংবা কবিতাও মনে পড়ছে না। আসলে সাদিয়ার চোখের কোন উপমা হয় না। মাহমুদ নিজের মনের এই গোপন খবর পেয়ে ঘাবড়ে গেল।

সাদিয়া চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'নতুন করে ভাবার কিছু নেই, খান সাহেব। নিজের জীবনের কথা আমি ভাবছি না। বাবাকে কথা দিয়েছি, এটাই বড়। যা হয়, হবে। শুধু আপনার কাছে অনুরোধঃ নিজেকে আর আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়াবেন না। আপনি চলে যান।'

মনের আরও একটা গোপন খবর জানা হল। বিদায় নেবার কথা ভাবতে পারছে না মাহমুদ। একেবারেই অচেনা এই নারীর কাছে এসে হঠাৎ মনের ভুলে সান্নিধ্যটাই সত্যি আর চিরন্তন মনে হয়েছিল। বিদায়টাই যে আসল সত্যি, একসময় মূর্তিমান হয়ে জিনিসটা এসে ধরা দেবে, একবারও ভাবেনি। কষ্ট হচ্ছে ওর। ভয়ঙ্কর কষ্ট!

কেন এই দুর্ঘটনা? নিজেকে কষে গাল দিল মাহমুদ। নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ঢাকা থেকে শেরপুরে এসেছিল ও। সেটা মিটেছে। এবার ফিরে যেতে হবে ঢাকায়। এ-ই তো স্বাভাবিক! এ-ই তো হবার কথা! তবু মনের কোন নরম কোণে কাঁটা ফুটল? কেন এই অসম্ভব, অবাস্তব সাধ?

উঠে দাঁড়াল মাহমুদ। সাদিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। বলতে

চাইল, 'অ্যাই রূপসী মেয়ে, আমার দিকে তাকাও। তোমার ভ্রমর-কালো দু-চোখের তারায় আমার সোনালি ছায়া পড়েছে। একটু তাকিয়ে থাক। আমাকে প্রাণভরে দেখতে দাও। আমি কখনও পৃথিবীর এত রূপ দেখিনি। জানতাম না, বিপদের আশঙ্কার মাঝখানে জীবন এত মধুর হতে পারে। একবার সুযোগ দেবে, অ্যাই মেয়ে? আমি তোমাকে সাধ্যাতিরিক্ত মিষ্টি সুরে ডাকব। কখনও কাউকে যে-নামে ডাকিনি, সে-নাম দেব তোমাকে।'

কিন্তু সে-সব কিছুই বলা হল না। শান্ত সুরে মাহমুদ বলল, 'চলি, মিস সাদিয়া। সন্ধে হয়ে আসছে।'

সাদিয়া হঠাৎ ফিরে তাকাল। মুখের বিস্ময়ভাবটা কাটাতে পারছে না। তবে কি ও নিজেও বিদায়ের কথা ভুলে গিয়েছিল? এ কি সম্ভব? অথবা তা কেবলই মাহমুদের বোঝার ভুল! কে জানে!

মাহমুদ আবার বলল, 'খুব সাবধানে থাকবেন।'

সাদিয়া হাসল। 'আমার ঘরের দরজায় মস্ত বড় তালা লাগান হয় রাতের বেলা। ভাববেন না।'

'সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা আপনার। কিন্তু সে-কথা ভাবার স্বাধীনতা আমারও। আমি যা-খুশি ভাবতে পারি। যা-খুশি চাইতে পারি।'

সাদিয়ার মুখে একটা ম্লান, মিষ্টি হাসি টলমল করে ওঠে। 'কোন লাভ নেই, খান সাহেব। হৃদয় খুঁড়ে শুধু বেদনাই পাবেন। মিছেমিছি চেষ্টা করবেন না।'

নিঃশ্বাসের শব্দে মাহমুদ বলল, 'কোত্থেকে এল এত বৈরাগ্য?'

সাদিয়া বলল, 'বৈরাগ্য নয়, শুধু জীবনটাকে একটু অন্যভাবে দেখা।'

'আপনার জীবন খুব দীর্ঘ হয়নি এখনও। দ্য নাইট ইজ স্টীল

ইয়াং। গোটা পথ সামনে পড়ে আছে।'

হঠাৎ রেগে গেল সাদিয়া। 'থাক। একাই হাঁটব সে-পথ। আমার সঙ্গী দরকার নেই। নিঃসঙ্গতাকে আমি ভয় পাই না। এখন আপনি যান, প্লিজ। আর আসবেন না আপনি। আর কোন ভুল করতে চাই না। আর কোন জটিলতা নয়।'

সাদিয়া কাঁদছে, মাহমুদ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল। ওই কথাগুলো গোপন কান্নার মতই। হাপরের মত ওঠানামা করছে ওর বুক। মাহমুদ চোখ নামিয়ে নিল।

তাহলে একটা "ভুল" হয়ে গেছে এই জীবনেই! মাহমুদ মনে মনে বলল, 'অ্যাই মেয়ে, বয়স কত তোমার? বড় জোর বাইশ! একটা "ভুল" করেই ক্লান্ত হয়ে গেছ? বাঁচবে কি করে তুমি? অন্তত শত ভুলের ভিত নেই যে-জীবনে, সেটা তো যখন-তখন মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে!'

'কিছু বলছেন?' নিরাসক্ত সুরে সাদিয়া বলল।

মাহমুদ চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আপনার জীবনের ওই গল্প তো শোনা হয়নি! শোনার সাধ রইল।'

সাদিয়া বলল, 'উঁহুঁ। ওটা কোন লম্বা গল্প নয়। খুব ছোট একটা ঘটনা। শুনে যান।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ, এখনই। ওই গল্প শোনার সূত্র ধরে আবার আসবেন আপনি, আমি চাই না।'

মাহমুদ সাদিয়ার এক নিঃশ্বাস ব্যবধানে বসে পড়ল। 'বলুন।'

সাদিয়া লম্বা শ্বাস নিল। 'বাবার এক ছাত্র ছিল। সে...'

বাধা দিয়ে মাহমুদ বলল, 'কাজী সাহেব শিক্ষক ছিলেন নাকি?'

'ও, বলা হয়নি। অবসর সময়ে বাবা কয়েকজন ভক্ত,

অনুরাগীদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন ধর্ম, ভাষা, ইতিহাস…এইসব বিষয়ে। বছর কয়েক আগে সে-অনুরাগীদের দলে যোগ দিল একটা ছেলে। কোঁকড়ান চুল, খয়েরী চোখ। মুখে সবসময় লেগে থাকত কবিতার চরণ। একদিন আমাকে নিয়ে কবিতা লিখে ফেলল। তারপর বাবার অগোচরে দিয়ে গেল [illegible]র হাতে।…কবিতা পড়লাম। ভাল লাগল। তারপর ইচ্ছে জাগল আরও কবিতা পাবার।'

'দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!' খোশমেজাজে মাহমুদ বলল, 'তারপর?'

'ছেলেটা রোজই কবিতা লিখে আনত। আমি ওর কবিতার একমাত্র পাঠক আর শ্রোতা। কিন্তু একদিন বিকেলে ছাদে হাওয়া খেতে খেতে যখন ওর স্বর গাঢ় হয়ে এল, তখন আমিও হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়লাম। চোখ বুজে অনুভব করছি, ওর নিঃশ্বাস এসে আছড়ে পড়ছে আমার কাঁধে, তখনই বাবা উঠে এলেন ছাদে।'

'আচ্ছা! তারপর?'

'তারপর…বুঝতেই পারছেন, আমার সেকেলে বাবার হাতে কেমন নাজেহাল হতে হল! ছেলেটাকে নোটিশ দিলেন, "আর কখনও এ-বাড়িতে এস না।"…আমি প্রথমে রাগ করেছিলাম। না-খেয়ে দুটো দিন কাটালাম। কিন্তু যখন মায়ের কথা তুলে বাবা কাঁদতে শুরু করলেন, তখন রাগ ভুলে গেলাম। মনে মনে শপথ করলাম, হৃদয়ঘটিত জটিলতার মধ্যে আর যাব না।'

হাসল মাহমুদ। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'শপথটা ছিল অবাস্তব।'

তীক্ষ্ণ চোখে সাদিয়া ওর দিকে তাকাল। 'কিন্তু আমার কাছে এ-শপথ অনেক মূল্যবান। প্রতিজ্ঞাটা রাখতে চাই আমি।'

'এই তবে আপনার গল্প!'

সাদিয়া আকাশের সিঁদুর-রঙা মেঘের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর বলল, 'হ্যাঁ। এবার আপনি আসুন, খান সাহেব।'

নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাহমুদ। আব্দুলাহ খান আর রাশেদার বিয়ের প্রমাণপত্র তুলে নিল টেবিল থেকে। রওনা হল দরজার দিকে। দরজার বাইরে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল। ভাবল, সাদিয়া ফিরে তাকিয়েছে হয়ত। কিন্তু সাদিয়া তখনও তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তখন আধো অন্ধকার আকাশে একটা কি দুটো তারা ফুটেছে। সাদিয়ার দৃষ্টি যেন সে তারাগুলো ছাড়িয়ে হারিয়ে গেছে অনন্তের দিকে। মাহমুদ কয়েক সেকেণ্ড ওকে পেছন থেকে দেখল। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। নতুন এক ধরনের উত্তাপ অনুভব করছে মাহমুদ। তাই শীতটা ওকে কাবু করতে পারছে না। মোটে দুটো দিনের মধ্যেই জীবনটা যেন বদলে গেছে—ভেবে বিষম অবাক হলো ও। সম্পূর্ণ অচেনা একটি মেয়ের সমস্যা এভাবে ওকে বিচলিত করবে, কখনও ভাবেনি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? সমস্যাটা কি শুধু ওই অচেনা মেয়ের? নাকি, ওর নিজেরও? হয়ত সবটা মিলেই নতুন একটা সমস্যা। এর সমাধান কি?

মাহমুদ জীবনে অনেক সমস্যার মোকাবেলা করেছে। এটা ওর কাছে একটা খেলা। কিন্তু আজকের সমস্যা সত্যিই বেকায়দায় ফেলেছে ওকে।

একটা ভাঙাচোরা হোটেলের টেবিলে এক প্লেট ভাত সামনে নিয়ে বসে মাহমুদ ভাবল, খাওয়া ফেলে সাদিয়ার কাছে ছুটে যাবে। বলবে, 'কিভাবে একা খেতে হয়, ভুলে গেছি। একটু সঙ্গ দেবে আমাকে?'

অনেকটা খাবার প্লেটে রেখে ও যখন উঠে পড়ল, এগিয়ে গেল

বেসিনের দিকে, তখন ওয়েটার অবাক হয়ে তাকাল।

'কি হল, সাহেব? আর খাবেন না?'

'নাহ্, খিদে নেই। বিল নিয়ে এস।'

রেস্ট হাউজের বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল মাহমুদ। ধোঁয়ার আঁকাবাঁকা রেখাগুলো ক্রমেই সাদিয়ার শরীরের আকার ধারণ করতে লাগল। কানে বাজতে লাগল ওর স্বর। সাদিয়া কখনও চেঁচিয়ে কথা বলে না। কিন্তু অনুচ্চ শব্দগুলো আত্মবিশ্বাসে ভরা থাকে সবসময়।

সাদিয়া কি করছে? ওর সঙ্গে দু-দিনের এই পরিচয়, এত কথা, সব ভুলে গেছে? এভাবে ভুলে যাওয়া কি ওর পক্ষে সম্ভব? হৃদয় বলে কিছুই নেই ওর? সবটাই খুইয়ে বসে আছে?

অসম্ভব! মাহমুদ সিদ্ধান্তে পৌঁছল। সাদিয়া নিজেও বুঝতে পেরেছে, ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই হঠাৎ খেলাটা শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু ও বোধহয় জানে না, ঠিক কি চায়। বোধহয় জানে না, ঠিক কতটুকু চায়। ও কি রবি ঠাকুরের ওই গানটা জানে? কি যেন কথাগুলো! স্মৃতি হাতড়ে অনেক কষ্টে খুঁজে পেল মাহমুদঃ

"এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—এ যে হৃদয় দহন জ্বালা, সখী।।

এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা,

এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।।…"

ঘুম এল না। বাতি না জ্বেলে দরজায় তালা লাগাল মাহমুদ। নিশি-পাওয়া মানুষের মত বেরিয়ে পড়ল পথে। কোথায় যাবে ও? কেন যাবে? কোন প্রশ্নেরই উত্তর জানা নেই। মাহমুদ লক্ষহীনভাবে হাঁটতে লাগল। তারপর একসময় সভয়ে আবিষ্কার করল, ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আধো অন্ধকারে কয়েকটা লোক নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে

কথা বলছে। ওরা কারা? এখানে কি করছে এত রাতে? লোকগুলো বারবার সাদিয়াদের বাসার দিকেই তাকাচ্ছে। শিউরে উঠল মাহমুদ। সাদিয়াকে কেন্দ্র করে কোন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করছে না তো ওরা?

একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালো মাহমুদ। যদি ওরা মাস্তানদেরই লোকজন হয়ে থাকে, তবে এভাবে আড়ি পাতা খুবই ঝুঁকির কাজ হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি? মাহমুদ লক্ষ করল, সংখ্যায় ওরা আটজন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। মাহমুদের অনুমানে কোন ভুল নেই। ওরা হামলা চালাবে সাদিয়ার ঘরে। কাঠ আর লোহা কাটার সরঞ্জাম যোগাড় করেছে। একজনের হাতে রিভলভার আছে, মনে হচ্ছে। হয়ত ওই অস্ত্রই ওর বুকের দিকে তাক করা হয়েছিল। শিউরে উঠল মাহমুদ।

লোকগুলো ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসের গেটে জটলা করতে লাগল। সাদিয়া কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ও কি জানে, কি সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে? কি করছে মেয়েটা? ওকে জাগাতে হবে, সাবধান করতে হবে।

মাহমুদ দ্রুত ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠল। কি করবে ও? চিৎকার দিয়ে লোক জড়ো করবে? নিরস্ত করবে ধর্ষকামী পশুগুলোকে? থানায় ছুটে যাবে? ডেকে আনবে পুলিস? অথবা একাই দলটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে?

কোনটাই পছন্দ হল না। চিৎকার দিয়ে সাদিয়াকে সাবধান করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। ও পালাতে পারবে না। গুণ্ডাগুলোই বরং সাবধান হয়ে যাবে। লোক জড়ো করা সম্ভব নয়। এ-অঞ্চলের সবাই ওই বেআইনী অস্ত্রধারী মাস্তানদের চেনে। কেউ ওদের রুখতে এগিয়ে আসবে না। আর থানা? নিতান্ত গ্রহের ফের না হলে কোন ভদ্রলোক থানায় যায় না। ওখান থেকে সাহায্য নিয়ে ফিরে

আসার আগেই যা ঘটার, ঘটে যাবে। একা দলটার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথাও ভাবা যাচ্ছে না। দিনের বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকম ছিল। তখন দলে ছিল অল্প বয়সের হুজুগপ্রিয় ছেলেরা। কিন্তু ওই লোকগুলোর চরিত্র অন্যরকম। ওরা আসলে শিকারী। শিকারটাই ওদের লক্ষ। তার জন্যে পানি যতটুকু ঘোলা করা দরকার, ততটুকুই করবে ওরা। প্রয়োজনে অনেক বেশি নৃশংস হবে। না-হয়ে ওদের উপায় নেই। নেশায় ঢুলছে ওরা। এ-নেশা মারাত্মক। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে খুন করে লাশ গায়েব করে দিতেও ওদের আটকাবে না।

ঘড়ি দেখল মাহমুদ। রাত একটা। সাদিয়া নিশ্চয়ই এখন ঘুমে অচেতন! বাইরে থেকে মৃদু শব্দে ডেকে ওকে জাগান যাবে না। বরং প্রতিপক্ষ টের পেয়ে যাবে। সাদিয়াকে সাহায্য করার একটাই উপায় আছে এখন। পেছনদিকের পাঁচিল টপকে উঠতে হবে কার্নিসের ওপর। তারপর রান্নাঘরের বক্স-এর ভাঙা জানালার শিক বাঁকিয়ে ঢুকতে হবে রান্নাঘরে। রান্নাঘরের দরজা খোলা আছে কিনা মাহমুদ জানে না। কিন্তু ওটুকু ঝুঁকি না নিয়ে এখন উপায় নেই। চেষ্টা করে দেখতে হবে।

দ্রুত রেজিস্ট্রি অফিসের পেছন দিকে চলে এল মাহমুদ। একটা পেয়ারা গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠে পড়ল কার্নিসে। হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক গজ এগোতেই পৌঁছে গেল রান্নাঘরের পেছন দিকে। কাঠের পাল্লাটা খোলা আছে। খোলা থাকারই কথা। মাহমুদ নিজেই খুলেছিল ওটা। ভেবেছিল, ট্রাঙ্কগুলো যখন তুলে রাখবে, তখন বন্ধ করে দেবে। কিন্তু ট্রাঙ্কগুলো আর বক্সে তোলা হয়নি। সাদিয়া বাধা দিয়ে বলেছে, 'কি হবে ওগুলো আবার ওপরে তুলে' আমি তো চলেই যাব! তার আগে সব জিনিসপত্র বুঝিয়ে দিতে হবে নতুন কাজী

সাহেবকে।'

সাদিয়া জানে না, কি ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বাস করে ও! মাহমুদ কয়েক সেকেণ্ডের চেষ্টায় দুটো শিক বাঁকিয়ে বক্স-এর প্যাসেজে ঢুকে পড়ল। খুবই সংকীর্ণ জায়গা। বেশ কষ্ট করে এগোতে হচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে মাহমুদ চলে এলো বক্স-এর ভিতরে। ট্রাঙ্কগুলো না-থাকায় সুবিধে হল। দড়ির প্রান্ত বক্স-এর দরজার পাল্লার সঙ্গে বেঁধে ফেলল দ্রুত হাতে। তারপর সেই দড়ি বেয়ে নেমে এল রান্নাঘরের মেঝেয়।

বুকের ভিতর একটা আশঙ্কা মোচড় দিয়ে ওঠে। সাদিয়া ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে না তো? ভেস্তে যাবে না তো গোটা পরিকল্পনা? রান্নাঘরে ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে চলে এল মাহমুদ। সর্বনাশ! রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। ও দরজায় কান পেতে শুনল, বাইরের দরজায় খুট্‌খুট্ করে শব্দ হচ্ছে। দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে শয়তানগুলো।

চাপা গলায় মাহমুদ ডাকল, 'মিস সাদিয়া!'

রান্নাঘরের পাশে ডাইনিং রুম। তার পাশেই সাদিয়ার শোবার ঘর, মাহমুদ জানে। কোন সাড়া না পেয়ে মাহমুদ আরও জোরে ডাক দিল, 'মিস সাদিয়া! রান্নাঘরের দরজা খুলুন।'

তবু কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

বাইরের দরজায় প্রচণ্ড শব্দ হল। হয়ত লোকগুলো ভেঙেই ফেলেছে দরজাটা। এখনই তারা ভিতরে ঢুকে পড়বে। ঘুমন্ত রাজকন্যেকে নিয়ে যাবে পাতালপুরীতে। সেখানে শুরু হবে মহোৎসব। মাহমুদ আর কিছু ভাবতে পারছে না। দৃশ্যটা কল্পনা করে ও শিউরে উঠল। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজায় প্রচণ্ড

ধাক্কা দিতে যাবে, এমন সময় ডাইনিং রুমে আলো জ্বলে উঠল। দরজার ফাঁকে চোখ রেখে মাহমুদ দেখতে পেল, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সাদিয়া। এরকম হামলার আশঙ্কা কি কখনও ওর মনে হয়নি? কিন্তু হওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। ওসব ভেবে লাভ নেই। মাহমুদ জানে, মানুষের মনের চেয়ে বড় বিস্ময় দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। ইহুদী প্রবচনে আছে, একটা মানুষের মনের চেয়ে দশটা দেশ চিনে ফেলা সহজ।

সাদিয়া হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কে? কে ওখানে?'

বাইরে থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। মাহমুদ বুঝতে পারল, দ্বিধার সময় আর নেই। এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দরজায় টোকা দিয়ে মাহমুদ চিৎকার করে উঠল, 'সাদিয়া!'

সাদিয়া স্প্রিং-এর পাক-খাওয়া পুতুলের মত ঘুরে দাঁড়াল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল রান্নাঘরের বন্ধ দরজার দিকে।

'সাদিয়া! আমি মাহমুদ। রান্নাঘরের দরজা খুলুন।'

সাদিয়া কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুলল। তারপর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল মাহমুদের দিকে।

'ভয় পাবেন না,' ফিসফিস করে মাহমুদ বলল, 'বক্স-এর জানালার শিক বাঁকিয়ে ঢুকে পড়েছি।'

'বাইরে কারা?'

'আপনার বিশেষ অর্তিথি। সংখ্যায় আটজন হবে। অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে।'

কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের ওপর বসে পড়ল সাদিয়া। 'আমাদের ঘরে তো···কিছুই নেই! টাকা, সোনাদানা, কিছুই···'

অসহিষ্ণু স্বরে মাহমুদ বলল, 'ছেলেমানুষের মত কথা বলবেন

না। আপনাদের বাসার সবচেয়ে দামী জিনিসটার খবর জানে ওরা। সেটাই ওরা চায়। আপনাকে তখনই বলেছিলাম…'

সাদিয়ার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। মাহমুদকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল ও। 'এখন…কি হবে?'

ঠিক সেই সময় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল লোকগুলো। তারপর নিজেরাই ভেঙে পড়ল হতাশায়। এরকম দৃশ্য দেখতে হবে, কল্পনাও করেনি ওরা। শিকার হাতছাড়া হওয়ার রাগে আর দুঃখে সাপের মত ফুঁসে উঠল অ্যাডভেঞ্চারওয়ালাদের নেতা। তার মুখে কাপড়ের একটা মুখোস আছে, কিন্তু কথায় ভদ্রতার মুখোসটুকু আর নেই।

'তুমি…কে?'

ঝাঁজাল স্বরে মাহমুদ বলল, 'চিনতে পারছ না? দুপুরেই তো আলাপ হল!'

'এখানে কি করছ?'

'জানোয়ারদের হাত থেকে সাদিয়াকে বাঁচানর চেষ্টা করছি।'

লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'চুপ কর! মতলববাজীর আর জায়গা পাওনি! তুমি নিজেই জানোয়ার! দূরের দেশ থেকে আমাদের এখানে একটা অসহায় মেয়ের সর্বনাশ করতে এসেছ!'

'সে-ব্যাপারে বোঝাপড়ার দায়িত্ব "অসহায় মেয়েটিকেই" দিন না! উনি আপনাদের সাহায্য চেয়েছেন নাকি?'

কয়েকজন মুখোসধারী সরে পড়ল পেছনদিক থেকে। এই পরিবর্তিত, জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে ওরা খাপ খাওয়াতে পারছে না।

'বড় বড় বুলি দিয়ে মাৎ করার চেষ্টা করবেন না। আপনার চালাকী আমরা ধরতে পেরেছি। আপনি আমাদের বোনটার সর্বনাশ করার চেষ্টায় ছিলেন। ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে গভীর রাতে…'

পেছন থেকে আরও একজন ধুয়া ধরল, 'আমাদের এলাকায় এসে

বিদেশী লোক শয়তানি করে যাবে? আমরা তা কখনও হতে দিতে পারি না। এই, কে আছিস, লোক ডাক!'

মাহমুদ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল। সাদিয়া চিৎকার করে উঠল, 'উনি গভীর রাতে শয়তানি করতে এসেছেন! আর আপনারা এসেছেন চোরের মত দরজা ভেঙে আমাকে রক্ষা করার জন্যে? মুখে মুখোস এঁটেছেন কিসের ভয়ে?'

এক টানে মুখোস খুলে ফেলে হানাদার দলের নেতা বলল, 'তুমি বেশি কথা বল না, সুন্দরী। তুমি তো আমাদেরই একজন! আমরা ওই লম্পট বিদেশীটাকে শায়েস্তা করতে চাই।'

এরপর আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না লোকগুলো। বাইরে বেরিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। 'কে কোথায় আছ, চলে এস। এক বিদেশী লম্পট ঢুকে পড়েছে কাজী বাড়িতে। এতিম, অসহায় মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই অন্যায়-অরাজকতার বিচার হওয়া দরকার। প্রমাণ করা দরকার, ধর্ম আর সমাজ এখনও উচ্ছন্নে যায়নি।'

অল্পক্ষণের মধ্যে কয়েকশ' লোক ঘিরে ফেলল বাড়িটা। মাহমুদ চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বাইরে বেরিয়ে সেই ক্ষিপ্ত জনতার মুখোমুখি হল।

একজন বয়স্ক লোককে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। একই প্রশ্ন তাঁর। 'এত রাতে তুমি কি চাও এখানে?'

মাহমুদ শান্ত সুরে বলল, 'স্ত্রীকে একদল ধর্ষকামী জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।'

'স্ত্রী!' কয়েকজনে মিলে চিৎকার করে উঠল। 'কে তোমার স্ত্রী?'

'সাদিয়া।'

চার

জনতা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সাদিয়ার মত স্তম্ভিত আর কেউ হয়নি। মাহমুদ আকাশের দিকে তাকিয়ে লম্বা শ্বাস নিল। ওর সম্মান, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত এখন নির্ভর করছে সাদিয়ার ওপর। সাদিয়া শুধু যদি বিস্ময় প্রকাশ করে, সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কিন্তু দু'জনের সম্ভ্রম আর অস্তিত্বের অভিন্ন স্বার্থে এই নির্জলা মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে ওকে। সাদিয়া কি এখন তা অস্বীকার করবে?

নিশ্চয়ই এতখানি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে না ও। ইংরাজিতে যাকে 'মব' বলা হয়, তা যে কি ভয়ানক জিনিস— বোঝার বয়স হয়েছে ওর। 'মব'–এর কোন হুবহু প্রতিশব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না, ভাবল মাহমুদ। বাংলায় একে কি বলা যায়? হুজুগে জনতা? উত্তেজনসাধ্য মানুষের দল? সে যা–ই হোক, 'মব' যদি একবার কোন হুজুগে মেতে যায়, তো র যুক্তির পথে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন।

মাহমুদের বিবৃতি অস্বীকার করলে সাদিয়া নিজেও বিপদে পড়বে। অতটা নির্বোধ ও নিশ্চয়ই নয়, মাহমুদ আশ্বস্ত হতে চাইল।

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, 'মরহুম জয়েনউদ্দীন কাজীর মেয়ে

সাদিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'রেজিস্ট্রি হয়েছে?'

এক সেকেণ্ড ভাবল মাহমুদ। তারপর দৃঢ় স্বরে বলল, 'না। রেজিস্ট্রি করার অপেক্ষায় আছি। নতুন কাজী সাহেব বোধহয় আজই এসে পড়বেন। ওটা শেষ করে আমরা ঢাকায় চলে যাব।'

পেছনদিক থেকে একটা ছেলে চিৎকার করে বলল, 'আমাদের এলাকা থেকে মেয়ে নিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়।'

'অ্যাই ছেলে,' ধমকের সুরে মাহমুদ বলল,'সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল। পেছন থেকে ফিসফিস কর না। সাদিয়া আর তোমাদের এলাকার মেয়ে নয়। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ও এখন আমার পরিবারের সদস্যা। ওর বাড়ি এখন ঢাকায়। আনুষ্ঠানিকতার কাজগুলো সেরেই আমরা ঢাকায় চলে যাব।'

'বললেই হল? আমরা এত সহজেই ছেড়ে দেব? পেয়েছেন কি?'

'সহজে ছাড়তে না চাও, বাধা দাও। কিন্তু তাতে খুব সুবিধে করতে পারবে না। আইন আমাদের পক্ষে। গোটা পুলিস বিভাগের সাহায্য পাব আমরা। তোমরা ফেঁসে যাবে অপরের বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ, অপহরণ ও হত্যার প্রচেষ্টা, এইসব মামলায়। একসঙ্গে দশটা মামলা চালানর মত সঙ্গতি আছে আমার। শুধু তাই নয়, আমার প্রাইভেট গার্ডবাহিনীও আছে। ঢাকায় খবর দেয়া হয়েছে তাদের প্রস্তুত হবার জন্যে। পুলিসে জানান হয়েছে। তাই শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি, আর কোন উস্কানি নয়। যদি শান্তি চাও, বাড়ি ফিরে যাও। ভোর হতে এখনও দেরি আছে। নিজেরা শান্তিতে থাক, অপরকেও শান্তিতে থাকতে দাও।'

আবার মতভেদ দেখা দিল জনতার মাঝে। ছোট ছোট উপদলে

বিভক্ত হয়ে আলোচনা করতে শুরু করল তারা। তারপর কয়েকজন মুরুব্বি গোছের মানুষ এগিয়ে এলেন।

'দেখ, বাবা, বুড়ো মানুষের কথা যদি শোন…'

'বলুন।'

'সাদিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, ভাল কথা। কিন্তু রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত তাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা এ-এলাকার বয়স্ক মানুষ। আমাদের তো একটা দায়িত্ব আছে!'

হাসল মাহমুদ। 'আপনাদের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় আমি পেয়েছি। থাক ওসব কথা। আপনাদের কথা মেনে নিতে রাজি আছি এক শর্তে। রেজিস্ট্রি না-হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব আমার স্ত্রীর অভিভাবক হিসেবে। এ-ব্যাপারে কারও কোন বাধা শুনব না।'

অল্প বয়সের ছেলেরা শর্ত মেনে নিতে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করল ওরা। বাস্তব অবস্থাটা মেনে না নিয়েও উপায় ছিল না। শীতটাও জাঁকিয়ে নেমেছে। ভোর চারটের দিকে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। সাড়ে চারটে নাগাদ শূন্য হয়ে গেল রেজিস্ট্রি অফিসের প্রাঙ্গন।

ভাঙা দরজাটা বন্ধ করা গেল না। বিব্রত মুখে ওরা দুজনে ড্রইং রুমে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল। তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল মিনিটের পর মিনিট। দুজনেই বুঝতে চেষ্টা করছে দুজনকে।

নীরবতা ভাঙল সাদিয়া। 'আশ্চর্য দুঃসাহস আপনার! কিভাবে এমন একটা ডাহা মিথ্যে বলতে পারলেন? আমি যদি প্রতিবাদ করতাম!'

মাথা নিচু করে হাসল মাহমুদ। 'অত ভাবনা-চিন্তা করে ঝুঁকি নেয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হল, ঝুঁকিটা নিতে হয়েছে জীবন

আর সম্ভ্রম বাঁচানর জন্যে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লোকগুলো পোড়া কাগজ চুরি করার জন্যে মাঝরাতে দরজা ভেঙে ঢোকেনি!'

সাদিয়া ওই ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল। নতুন করে মনে পড়ার পর কাঁপতে লাগল। মাহমুদ ওর হাতে হাত রাখল। 'আর ভাববেন না। নো ড্যামিজ ইজ ডান ইয়েট। শান্ত হোন।'

শান্ত হবার বদলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সাদিয়া। 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না। চারদিকে কি ঘটছে এসব?'

'নতুন করে কিছু ঘটেনি।'

ঝাঁজের সঙ্গে সাদিয়া বলল, 'ঘটেনি মানে! আমার পরিচয়-পদবী-ঠিকানা সব আপনি পাল্টে দিলেন মুখের একটা কথায়! কয়েকশ' লোক সাক্ষী হয়ে গেল। এখন আর বদলান যাবে না কিছু। হাতের তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে। তাকে আর ফেরাবেন কি করে?'

মাহমুদ সাদিয়ার পিঠে ওর ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিল। 'তীরটা না ছুঁড়লে আমরা দু'জনেই মারা পড়তাম।'

সাদিয়ার চোখে যেন আগুন জ্বলছে। 'কেন আপনি জানালা ভেঙে ঢুকেছেন? আমার ভাগ্যে যা হবার তা-ই হত! আপনাকে আমি নিষেধ করেছিলাম। কেন কথা শুনলেন না? কেন আমাকে...'

কান্না এসে ওর কণ্ঠরোধ করল। মাহমুদ গাঢ় স্বরে বলল, 'মাফ করবেন। বুঝতে পারিনি, আমি আপনাকে ওই চমৎকার অ্যাডভেঞ্চার থেকে বঞ্চিত করেছি। কি করে বুঝব, বলুন? মানুষের মনের গভীর কোণে কত বিচিত্র সাধ জন্মায়!'

'থামুন! আপনি অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছেন।'

মাহমুদ হাসল। 'একটুও না। সীমা অতিক্রম করা তো দূরের কথা, আপনার ওপর কোন অধিকারই আমি প্রয়োগ করিনি।'

শ্লেষের সুরে সাদিয়া বলল, 'অথচ আমার সম্মতির অপেক্ষা না

করেই কয়েকশ' মানুষের সামনে আমাকে আপনার স্ত্রী বলে ঘোষণা করেছেন। আমার পরিচয়, পদবী, ঠিকানা, সবই বদলে দিয়েছেন।'

'ওটা অতীতের কথা। এবার বর্তমানে ফিরে আসুন। ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। সিদ্ধান্ত নিন, এখন কি করবেন!'

'আমি আর কি বলব? আপনিই তো আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন! আপনিই বলুন না, আমি এখন কি করব!'

'লোকে যখন জেনেই গেছে, তখন আর নতুন নাটকের অবতারণা করে কি লাভ? আসুন, সত্যিই শুভ কাজটা সেরে ফেলি।'

সাদিয়া কান্না ভুলে মাহমুদের দিকে তাকিয়ে রইল। 'এসব কি বলছেন? আমি আপনাকে চিনি না, জানি না। আপনিও আমাকে...'

'ক'জন স্বামী-স্ত্রী বিয়ের আগে পরস্পরকে চেনা-জানার সুযোগ পায়? ধরুন, আপনার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তাঁর পছন্দমত একটি ছেলের হাতে সঁপে দিতেন আপনাকে। বিনা প্রতিবাদে তার হাত ধরে ঘর করতে যেতেন না? মেনে নিতেন না তাকে স্বামী হিসেবে?'

সাদিয়া বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'বাবা বেঁচে থাকলে কি হত, সে-কথা এখন তুলে লাভ নেই।'

'না তুলেও কোন লাভ নেই, সাদিয়া।'

সাদিয়া আড়চোখে মাহমুদের দিকে তাকাল। 'ঢাকায় কে কে আছে আপনার? এমন দুর্ঘটনা আগেও দু-একটা ঘটিয়েছেন নাকি?'

মাহমুদ হাসল। 'বিশ্বাস যখন করতে হবে, তখন চোখ বুজেই করুন না! জেরা করে লাভ কি?'

'কথা ঘোরাবেন না। প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'ভোর হয়ে আসছে, সাদিয়া। কাজের কথা সেরে ফেলা যাক। ফালতু আলাপের সময় আমরা পরে অনেক পাব। আপনার মত কোন

ছোটখাট "সিলি মিস্‌টেক" করার সুযোগও আমি পাইনি। এখন মনে হচ্ছে, দু-একটা ভুল-চুক হলেই ভাল হত। যাক সে-কথা। একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি আমরা।'

সাদিয়া কথা বলল না। তাকিয়ে রইল মাহমুদের মুখের দিকে।

মাহমুদ বলল, 'বিয়ে বলতে আপনি কি বোঝেন, আমি জানি না। আমি জানি, বিয়ে একটা চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'সবার জীবনে এক ধরনের চুক্তিতে বিয়ে হবে—এমন কোন কথা নেই।'

'খাঁটি সত্যি কথা।'

'এই তো পথে আসছেন! তা হলে আসুন, একটু ভিন্ন ধরনের চুক্তি করি আমরা।'

'যেমন?'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচিত হব। আপনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু জীবন যাপনের বেলায় আমি কোন অধিকারই আপনার ওপর প্রয়োগ করব না। সোজা কথায়, আমাদের জীবন আগের মতই আলাদা থাকবে। "আমি" কখনও বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তুলব না। তবে "আপনি" ইচ্ছে করলে যে-কোন সময় সে-দাবি তুলতে পারেন এবং আমি তখনই তা মেনে নেব। প্রকাশ্যে আমরা স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর মতই আচরণ করব। তারপর ঘরের খিল তুলে যখন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হব, তখন আমরা আগের মতই দুই ভিন্ন মানুষ। পৃথক শয্যা, স্বতন্ত্র জীবনধারা। কেউ কারও প্রাইভেসিতে নাক গলাব না। কোন দাবিতেই একে অপরকে বিরক্ত বা বিব্রত করব না। একে বলা হয় "ম্যারেজ অভ্ কনভিনিয়েন্স"। রাজি আছেন এমন বিয়েতে?'

সাদিয়া স্তম্ভিত হয়ে মাহমুদের দিকে তাকিয়ে আছে। মাহমুদ রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ ধরাল। পানির কেতলি চড়াল তার ওপর। ফিরে এসে বলল, 'ভাবনার বেশি সময় পাবেন না, সাদিয়া। মনস্থির করুন।'

'যদি রাজি না হই, আপনার ভূমিকা কি হবে?'

শান্ত সুরে মাহমুদ বলল, 'এক কাপ চা খাব। তারপর সোজা বাসস্ট্যাণ্ডে যাব। আর কখনও পিছন ফিরে তাকাব না। নিঃসঙ্গতা আসলে খুব খারাপ জিনিস নয়, আপনি তো জানেন! ভাবব, একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি পরপর দু-রাত। আমার জীবনে অনেক ব্যর্থতা আছে, কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি নেই।'

কয়েক মিনিট নীরবে কাটল। সাদিয়া উঠে এসে রান্নাঘরে মাহমুদের পাশে দাঁড়াল। 'চুক্তির যে-খসড়া শোনালেন, তাতে মনে হচ্ছে, আপনার কোন দাবি নেই। সত্যিই আপনি এ-বিয়ে থেকে কোন লাভ দাবি করবেন না? কিছুই চাইবেন না?'

মাহমুদ এক কাপ চা বাড়িয়ে ধরল সাদিয়ার দিকে। নিজে এক কাপ টেনে নিয়ে চুমুক দিল। 'মাত্র একটা জিনিস।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল সাদিয়া।

মাহমুদ বলল, 'রূপার কথা আপনাকে বলেছি। ওকে অত্যন্ত ভালবাসি আমি। ওকে ওই বেহায়া মহিলার সঙ্গে অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দিতে চাই না।'

'জানি। সে-জন্যেই শেরপুরে ছুটে এসেছেন ভাইয়ের বিয়ের প্রমাণপত্র খুঁজে বার করতে। সেটা তো পেয়েছেন!'

'আরও একটা শর্ত আরোপ করেছে আদালত। রূপাকে কাছে রাখতে হলে আমার ঘরে স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়ের মত কোন বয়স্কা মহিলা থাকা চাই। এমন কেউ আমার নেই, যাকে দিয়ে ওই শর্ত পূরণ

করতে পারি। আপনি যদি এ-বিয়েতে রাজি হন, তবে শুধু একটা জিনিসই প্রত্যাশা করব। রূপাকে আপনি বুকে টেনে নেবেন। ওকে কষ্ট দেবেন না। স্নেহ-মমতায়-ধৈর্যে ওকে মানুষ করবেন সন্তানের মত। বেশিদিন নয়, আর তিন-চার বছরের মধ্যেই ও প্রাপ্তবয়স্কা হবে। তখন আপনি হবেন পুরোপুরি দায়মুক্ত।'

আবার নীরবতা নেমে এল। অসহ্য দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছটফট করল দিয়া। তারপর একসময় চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উপলব্ধি করল, প্রস্তাবটা খারাপ নয়। এটা মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। জেদের বশে মুখে যা-ই বলুক, ও একটু একটু করে বুঝতে পারছে, আর একটু হলেই কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল! সাদিয়া জীবন-মৃত্যুর পরোয়া করে না। কিন্তু নারীত্ব আর সম্ভ্রমের কথাটা মনে হলেই শরীর কেঁপে উঠছে। মাত্র দু-এক মিনিটের ব্যাপার! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষটা যদি ছুটে না আসত, কি ঘটত? ভাবতে পারছে না সাদিয়া। একবার নয়, দু-দুবার নিশ্চিত বিপদের মুখে ও বুক পেতে দিয়েছে। আড়াল করেছে সাদিয়াকে। সাদিয়া নির্ভর করতে পারে ওর ওপর। একজন মানুষকে চিনতে এত দেরি হওয়া উচিত নয়। মানুষটা ভাল। অনেক বড় মন ওর।

সাদিয়া চোখ মুছে মুখ তুলল। 'বেশ, আমি রাজি।'

মাহমুদ হাত বাড়িয়ে দিল। সাদিয়া সে-হাতে হাত না রেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি খুব কুৎসিত কথা বলেছেন আমাকে।'

হাসল মাহমুদ। 'তখন যুদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। যদি মনে খুবই কষ্ট দিয়ে থাকি, মাফ করে দিন। আর কখনও বলব না।'

সাদিয়া তবু মুখ ফেরাল না। মাহমুদ হাত ফিরিয়ে নেবার আগে দেখল, সাদিয়া হঠাৎ আঁকড়ে ধরেছে ওই হাত। কাঁদতে কাঁদতে

বলছে, 'আমার সামনে সব অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

নতুন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এসে পৌঁছলেন সকাল দশটার দিকে। সাদিয়া তাকে অফিস-কাম-রেসিডেন্স-এর সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল।

'তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ, মা,' কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখে মন্তব্য করলেন সুলাইমান সাহেব, 'এতখানি দায়িত্ব অফিসের বেতনভোগী লোকজনও পালন করতে চায় না।'

মাহমুদ একদিনের বাসী কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। পুরো দু'দিন ও বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। কাগজটা সরিয়ে কাজী সাহেবের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'বেতনভোগী লোকজন মনে করেন, বেতনটা তাঁর কাজের পারিশ্রমিক নয়, এমনিতেই পাওনা। কাজের জন্যে তিনি হয় ওভারটাইম অ্যালাউন্স দাবি করেন, নয় তো ঘুষ খান।'

সাদিয়া বলল, 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, ওনার ফেলে-যাওয়া সব অফিসের কাগজপত্র আর সম্পত্তি আপনার হাতে তুলে দেব। কিংবা বলা চলে, বাবা আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন।'

মাহমুদ মৃদু হাসল। 'কিন্তু, কাজী সাহেব, উনি ভাবেননি, ওই অঙ্গীকার পালনের জন্যে তাঁর মেয়েকে কতখানি মূল্য দিতে হবে।'

সুলাইমান সাহেব শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। মাহমুদ আগের দিনের ঘটনা খুলে বলল। সুলাইমান সাহেবের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চাপা ঝাঁজের সঙ্গে মন্তব্য করলেন, 'আমরা কি বর্বর যুগে বাস করছি?'

সাদিয়া বলল, 'ওর কথায় ঘাবড়াবেন না। সুযোগ পেলেই জামাইরা শ্বশুরদের এক হাত দেখে নেয়। আমার বাবা অবিবেচক ছিলেন না। প্রতিবেশীরা সবাই ওকে খুব মান্য করত। ভেবেছিলেন,

তাঁর মৃত্যুর পর ওরা সবাই আমার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে।'

হাসতে চেয়েও থেমে গেলেন সুলাইমান সাহেব।

দুপুরের রান্না চড়িয়ে সাদিয়া বলল, 'এখানে কাজের লোক পাওয়া যায় না। রেঁধে খেতে আপনার বেশ কষ্ট হবে। এ-বেলাটা আমিই রান্না করে আপনাদের খাওয়াব।'

'বেশ তো, বেশ তো,' সস্নেহ হাসির সঙ্গে সুলাইমান সাহেব বললেন, 'আমার পরিবার দু-চারদিনের মধ্যেই এসে পড়বে। কয়েকটা দিন কষ্ট করে চালিয়ে নেব, আর কি। এখানকার লোকেরা যে কাজ করে খেতে চায় না, পদে পদে তার প্রমাণ পাচ্ছি। কাজের লোকেরা এত গুণ্ডামি করার সময় পায় কোথায়? অন্যের প্রাইভেট ব্যাপারে নাক গলাবার সুযোগ পাবার কথা নয় তার।'

মাহমুদ বলল, 'আসলে কোথাও তেমন কাজ হচ্ছে না। শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত, সবখানে কাজের চেয়ে কথা বেশি। কাজ করে খুব অল্প লোকে। বাকি সবাই কথার জোরে তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। আমার একটা ছোট শিল্প আছে, বুদ্ধিজীবীরা যাকে "রুগ্ন শিল্প" বলে, তা-ই। সেখানে কর্মী আছে জনা দশেক। বাকি পঁচিশজন হয় ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, না হয় পলিটিশিয়ান। যাঁরা ম্যানেজমেন্টে আছেন, তাঁরা নিজেদের লেবার লীডার বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান। এঁরা হচ্ছেন পলিটিশিয়ান। এঁদের কাজ নেতা আর মুরুব্বিদের তুষ্ট রাখা।'

'কিভাবে?'

'নেতা-মুরুব্বিদের তুষ্ট রাখার কাজটা খুব সোজা। বিরোধী শিবিরের ওয়ার্কার আর ম্যানেজারদের সম্পর্কে হাজারটা অভিযোগ তৈরি করেন ওঁরা। নেতা-মুরুব্বিরাও বড় পছন্দ করেন নিজেদের

বিরুদ্ধে অন্যের কুৎসার বানোয়াট কাহিনী শুনতে। তা···ওই টাউটগুলোই সবচেয়ে ভাল আছে। আমি মাঝে মাঝে "ফায়ার" করছি নিচের দিকের ছা-পোষা লোকগুলোকে অথবা ওপরের দিকের মুরুব্বিদের। মাঝখানের সেয়ানা ঘুঘুগুলোকে ধরতে পারছি না। মুরুব্বি বদল হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সুর পালটে ফেলছে। নতুন মুরুব্বি এসে ওদের প্রোটেকশন দিচ্ছে।'

'চমৎকার!' হেসে ফেললেন সুলাইমান সাহেব। 'এভাবেই চলছে গোটা দেশ। কোথাও কাজ হচ্ছে না। কোথাও নীতি নেই, শৃঙ্খলা নেই। শুধু আছে রাজনীতি আর বিশৃঙ্খলা।'

সুলাইমান সাহেব বাড়িটা ঘুরে দেখলেন। রান্নাঘরে ফিরে এসে বললেন, 'বুঝলে, মা, তোমার বাবা সরকারের সব জিনিসপত্র যত্নে রেখেছিলেন। শুধু নিজের কোন যত্ন নেননি। সন্তানের যত্ন নিয়েছেন বলেও মনে হয় না। তিনি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পিওন, দারোয়ান আর মালির সেবা পাবার অধিকার রাখতেন। কিন্তু আদায় করেননি সেসব অধিকার। সব কাজই বোধহয় নিজের হাতে করেছেন। অত্যন্ত সৎ আর নিরীহ মানুষ ছিলেন বেচারা।'

মাহমুদ বেসিনে প্লেট-গ্লাস ধুয়ে সাদিয়াকে সাহায্য করছিল। বলল, 'ওখানেও একটা সমস্যা আছে, কাজী সাহেব। আমাদের সমাজের দুর্নীতিবাজ লোকগুলো যতটা বেপরোয়া, সৎ মানুষেরা ঠিক ততখানিই ভীরু। সাহসী সৎ মানুষের বড় অভাব।'

সুলাইমান সাহেব বললেন, 'বিকেলে একবার ডি. সি. সাহেবের অফিসে যাব। উনি বলেছেন অফিসের কোন সমস্যা থাকলে জানাতে। এখন বল তো, মা, আজ আমার অফিসের কোন কাজ বাকি আছে কিনা! কোন মক্কেল এসেছিল?'

সাদিয়া মাথা নিচু করল। ঠোঁটের কোণায় রহস্যময় হাসি।

মাহমুদ বলল, 'এ-অফিসে আপনার প্রথম মক্কেল সামনেই বসে আছে।'

'মানে!'

ব্যাখ্যা করতে হল না। কাজী সাহেব নিজেই বুঝে নিলেন কথাটা। 'তোমাদের বিয়ে হয়নি?'

মাহমুদ বলল, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা।'

সুলাইমান সাহেব খাতা-পত্র বার করলেন। দুপুরের খাওয়ার আগেই রেজিস্ট্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হল। মাহমুদ দেখল, কাঁপা কাঁপা হাতে চুক্তিপত্রে সই করছে সাদিয়া।

কাজটা শেষ হবার পর সাদিয়াকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষের মত মনে হল। ও যেন আর এখানে নেই, হারিয়ে গেছে দূরে কোথাও। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কথা বলল অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে। শুধু সুলাইমান সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করার সময় উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল ও।

'আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এমন কেউ নেই, যার কাছে দোয়া চাইতে পারি। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। মা-কে হারিয়েছি সেই ছোটবেলায়। বাবাও গেলেন। নীতির প্রশ্নে বাবা চিরদিন অটল থেকেছেন। তাই তাঁর বন্ধু ছিল না। আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বর্জন করেছে; এড়িয়ে চলেছে প্রতিবেশীরা। আজ আমার কেউ নেই!'

সুলাইমান সাহেব সাদিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'অমন কথা কেন বলছ, মা? এই যে তোমার স্বামী! ও-ই তো তোমার জীবনের সব! ও তোমার বন্ধু, প্রেমিক, অভিভাবক। আজ থেকে তোমরা এক ও অভিন্ন সত্ত্বায় পরিণত হলে। আবার একটা নতুন জেনারেশন শুরু করার দায়িত্ব নিয়েছ তোমরা। রাহমানুর রাহিমের করুণায় তোমাদের কোল জুড়ে সন্তান আসবে। সব না-পাওয়ার

দুঃখ ভুলে যাবে তোমরা।'

সাদিয়া কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। এমন সময় মাহমুদের দিকে চোখ পড়ল। ওর দৃষ্টিতে নিঃশব্দ সতর্ক সঙ্কেত।

'কিছু বলবে, মা?'

সাদিয়া বিব্রত হয়ে পড়ল। 'না, কিছু না।'

মাহমুদ কোমল গলায় বলল, 'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। সন্ধের আগেই আমরা রওনা হব।'

মনে মনে চমকে উঠল সাদিয়া। মাহমুদ ওকে "তুমি" বলেছে। এক বিচিত্র অনুভূতি জাগল।

সুলাইমান সাহেব বললেন, 'আজকের রাতটা না হয় আমার আতিথ্যে থাক তোমরা! আমার সামনে কেউ তোমাদের কিছু বলতে পারবে না।'

সাদিয়া আঁৎকে উঠল। 'না, না। আর এক রাতও এখানে নয়।'

মাহমুদ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করল। জামালপুর এখান থেকে বারো মাইল পথ। সন্ধের পর একটা মেল ট্রেন আছে। ওটা ধরতে না পারলে সারারাত স্টেশনে কাটাতে হবে। কারণ অত রাতে কোন হোটেল-বোর্ডিং-এ জায়গা পাওয়া যাবে না।

'গুছিয়ে নিতে আমাকে একটু সাহায্য করবে? অত্যন্ত নার্ভাস লাগছে।'

মাহমুদ মনের গভীর কোণে সাদিয়ার "তুমি" সম্বোধন উপভোগ করল। সন্দেহ নেই, অভিনয় করছে মেয়েটি। জীবন নিয়ে যে-নতুন খেলা শুরু হয়েছে, তা চলতে থাকবে। হয়ত নতুন জটিলতা আবার বিপর্যস্ত করবে জীবনটাকে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। নতুন জীবনধারাটাই মেনে নিতে হবে। কখনও মিথ্যে অভিনয়কে সত্যি ভেবে আনন্দিত হবে ওরা; আবার কখনও সত্যিকার অনুভূতিকে মিথ্যে

মনে করে দুঃখ পাবে। তবু তো এটা জীবন! এই জীবনই ওদের যাপন করতে হবে।

একটা ব্যাগে ওর জিনিসগুলো আঁটল না। কিছু কাপড় একটা সেলোফেন ব্যাগে ভরল মাহমুদ। 'যাবার পথে রেস্ট হাউজ থেকে আমার সুটকেসটা নেব। ওতে জায়গা আছে। এগুলো এঁটে যাবে।'

বইয়ের আলমারির দিকে করুণ চোখে তাকাল সাদিয়া। 'আমার বইগুলোর কি হবে? পনের বছর ধরে জমিয়েছি।'

মাহমুদ সুলাইমান সাহেবকে অনুরোধ করল বইগুলো ঢাকায় পাঠানর ব্যবস্থা করার জন্যে। রাজি হলেন তিনি। 'কোন অসুবিধে নেই। বইগুলো ছাড়া আরও যদি কিছু থাকে, দেখিয়ে দাও। আমি সব প্যাক করে ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির সাহায্যে ঢাকায় পাঠিয়ে দেব।'

সাদিয়া দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, 'ওই...ফুলের টবগুলো...'

'বেশ, ওগুলোও পাঠিয়ে দেব।'

বাসের পেছনদিকের সীটে মাহমুদের পাশে সঙ্কোচের সঙ্গে বসল সাদিয়া। কাঁধ ঘুরিয়ে তাকাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসের দিকে।

সুলাইমান সাহেব দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন।

বাবা-মা'র কথা মনে পড়ল সাদিয়ার। সাত বছর বয়সে একদিন মা'র সঙ্গে মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছে ও। বাবা ঠিক এমনি করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলেন।

সাদিয়ার মামাবাড়ি বিক্রমপুর। ওদের একমাস থাকার কথা ছিল ওখানে। কিন্তু এক সপ্তা যেতে না যেতেই সাদিয়া হাঁপিয়ে উঠল। পুকুরের তিন-চারসেরী রুই-কাতলা ধরা, পাশের গ্রামে যাত্রা শুনতে যাওয়া, পিঠে খাওয়া, সব আনন্দেই ভাটা পড়ল। মামা-মামী সারাদিন চেষ্টা করেন ওর মুখে হাসি ফোটাতে। কিন্তু বাবার নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে বিষণ্ন হল সাদিয়া। কি করছেন বাবা?

ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছেন? ফারসী শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করে সাদিয়াকে শোনাতে না পেরে নিশ্চয়ই মনটা খুব খারাপ লাগছে ওঁর! কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলল না সাদিয়া। ও জানে, মাস শেষ হবার আগে শেরপুরে ফিরে যেতে কিছুতেই রাজি হবেন না ওর মা। কিন্তু একদিন সন্ধেয় বিছানায় মায়ের পাশে শুয়ে যখন এপাশ-ওপাশ করছিল, তখন হঠাৎ ওকে চমকে দিয়ে মা বললেন, 'মন খারাপ লাগছে, সাদিয়া?'

সাদিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

মা অনেকক্ষণ উসখুস করে বলে ফেললেন, 'শেরপুরে ফিরে যাবি?'

আনন্দে নেচে উঠল সাদিয়া। 'দারুণ হয়, মা। চল, কালই ফিরে যাই।'

সাদিয়ার মামা-মামী বিষম অবাক হলেন। মামী মুখ টিপে হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আট দিনের মাথায় ফিরে এল ওরা। অবাক হয়েছিলেন জয়েনউদ্দীন কাজীও। কিন্তু তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু ছলছল করছিল, মনে আছে সাদিয়ার।

অনেকটা দূরে এসে পড়েছে ওরা। পেছনে ফেলে এসেছে বাজার, স্কুল, কলেজ, বান্ধবীদের বাড়ি। অনেক স্মৃতির ভিড় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে ওকে। খুব ছোটকালে বাবার হাত ধরে বাজারে আসত সাদিয়া। বাবা যখন দরকষাকষি করতেন, ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। একটা বিখ্যাত চায়ের দোকান আছে ওই তেতলা ব্যাঙ্ক অফিসের ঠিক পেছনে। ওখানে অনেকবার চা খেয়েছে ও।

কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে যখন বাসটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল, তখন বান্ধবী আর শিক্ষকদের কথা মনে পড়ল। হয়ত আর কোনদিন এখানে আসা হবে না। আর কখনও দেখা হবে না পরিচিত,

প্রিয় মুখগুলোর সঙ্গে।

কলেজ ভবনের পাশেই একটা ছোট পার্ক। এখানেও ওর কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিকালের অনেকটা সময় কেটেছে। যে-ছেলেটি ওকে নিয়ে কবিতা লিখত, একদিন এই পার্কে হাঁটতে হাঁটতে ধরা গলায় বলে ফেলল, 'আমি আমার কবিতায় একজন নারীকে কিছু বলতে চাই। জানি না, সে বুঝতে পারে কিনা।'

সাদিয়া হাসল।

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'হয়ত এমন চমৎকার, রোমান্টিক পরিবেশ আর কখনও পাব না। তাকে আমি ওই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

সাদিয়ার চোখে বাবার কঠিন মুখের ছবি ভেসে উঠল। গম্ভীর গলায় বলল, 'না, থাক।'

ছেলেটি আশাহত, ব্যথিত মুখে অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। সত্যিই আর কখনও ছেলেটির সঙ্গে এখানে আসা হয়নি। জয়েনউদ্দীন সাহেব চাইতেন না, তাঁর বয়স্কা মেয়েটি পার্কে ঘুরে বেড়াক।

সব পড়ে রইল শেরপুরে। শেরপুর থেকে সাদিয়া চলে এসেছে অনেক দূরে। ওর চোখ ভিজে উঠল। কে জানে, নতুন জীবনটা কেমন হবে! কেমন হবে নতুন পরিবেশ!

মাহমুদ সাদিয়ার কাঁধে হাত রাখল। নিঃশব্দে অভয় দিচ্ছে যেন। তবু সাদিয়া আশ্বস্ত হতে পারছে কই?

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর সাদা বালিয়াড়ি চোখে পড়ল। শীত নামছে, নামছে কুয়াশা। সাদিয়া নদীর দিকে তাকাল। ঝাপসা লাগছে সব কিছু।

পাঁচ

ভাবনার ভার জমছিল মাহমুদের মনেও। গত দু-দিনের ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে ভাবার সুযোগ আগে পায়নি। এখন হাতে অফুরন্ত সময়। সাদিয়া যাত্রা শুরুর পর থেকে একটি কথাও বলেনি। উপর্যুপরি বিস্ময়ের আঘাত ওকে ভীষণ বিপর্যস্ত করে তুলেছে। স্বাভাবিক হবার জন্যে অনেকটা সময় দরকার। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তা ছাড়া মাহমুদ নিজের সঙ্গেও অনেক বিষয়ে বোঝাপড়া করে নিতে চায়।

একবার মনে হয়েছে, ভালভাবে না ভেবে বিয়ের মত একটা সিদ্ধান্ত নেয়া বোধহয় উচিত হয়নি। সাদিয়া অবস্থার চাপে পড়ে রাজি হয়েছে, কিন্তু মনেপ্রাণে কখনও মাহমুদকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারবে কিনা কে জানে! তারপর আবার ভাবল মাহমুদ। যা অনিবার্য ছিল, তা-ই হয়েছে। ওই মুহূর্তে ও যদি সাদিয়াকে বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে পরিচয় না দিত, তবে উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলো কি করত, ভাবাই যায় না।

অনিবার্য বিপর্যয় এড়ান সম্ভব হয়েছে এক মুহূর্তের ওই সিদ্ধান্তে। পুরোপুরি বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা করতেই হবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু সাদিয়া নিশ্চয়ই সব বিবেচনা করে

বিয়েটাকেই সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিয়েছে! আর মাহমুদ নিজের উদ্যোগে যে-ধরনের চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে সাদিয়ারই লাভ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ওর মনের ওপর চাপ পড়বে না। শুধু বাইরের মানুষদের সামনে পরিচয়ের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে ওকে, কিছুটা অভিনয়ও করতে হবে। খুব বেশি অসুবিধে হবার কথা নয়। একজন লেখক বলেছিলেন, মেয়েরা জাত অভিনেত্রী। লেখকের নাম মাহমুদের মনে নেই। শুধু কথাটা মনে আছে। রূপার দায়িত্বের ব্যাপারটা প্রথমদিকে হয়ত ওকে বিব্রত করবে। কিন্তু মাহমুদের দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা ঠিক হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

ফেরি পার হয়ে রিকশায় উঠল ওরা। সাদিয়া সারাক্ষণ পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। মাহমুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যা হারিয়ে যায়, তা আগলে বসে থাকার চেষ্টা অত্যন্ত কষ্টকর। তবু মানুষ অতীতের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মানুষ এই ভেবে সুখ পায় যে অতীতের সবই উপভোগ্য আর আনন্দময় ছিল।

আব্দুল্লাহ যেদিন রাশেদা আর রূপাকে সঙ্গে নিয়ে শেরপুর থেকে ঢাকায় ফিরে এল, সেদিনটার কথা আজও ভোলেনি মাহমুদ। রাশেদার মন-প্রাণ বুঝি তখনও পড়েছিল শেরপুরে। কিছুতেই ওই স্মৃতি ভুলতে পারছিল না সে। কিন্তু কয়েকটা দিন যেতে-না-যেতেই সবকিছু বদলে গেল। এরপর বছরের পর বছর কেটেছে। রাশেদা ব্যস্ত থেকেছে বর্তমান নিয়ে। অতীতের দিকে চোখ ফেরানর অবকাশ পায়নি। একবারও যেতে চায়নি শেরপুরে।

দুর্ঘটনার ওপর আসলে মানুষের কোন হাত আছে কি? বারবার ভেবেও এ-প্রশ্নের উত্তর পায়নি মাহমুদ। লোকে বলে, সাবধানের মার নেই। কিন্তু মারেরও সাবধান নেই—কথাটা কারও মনে থাকে

না। আব্দুল্লাহ বন্ধুদের সঙ্গে হরিণ শিকার করতে গিয়েছিল শেরপুর। সেখানে এক দুর্ঘটনার মাঝেই রাশেদার সঙ্গে ওর পরিচয়। পরিচয়টা 'পরিণয়' পর্যন্ত গড়াতে একটুও সময় নিয়নি। সবটাই দুর্ঘটনা। আজ মাহমুদ সাদিয়াকে বিয়ে করে ঢাকায় ফিরে আসছে সে-ও এক দুর্ঘটনা। দুটো প্রায় একই রকমের। অনেক অমিলের মাঝেও কোথায় যেন একটা মিলের সুর বাঁধা আছে।

জামালপুর স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনের খবর নিতে গেল মাহমুদ। ট্রেইনস্ অফিসের বাবুটি ঘুমোচ্ছিলেন। মহা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'ঢাকার ট্রেনের খবর নাই। অপেক্ষা করেন।'

সাদিয়াকে প্রথম শ্রেণীর মহিলাদের ওয়েটিং রুমে বসিয়ে প্ল্যাটফরমে পায়চারি করতে লাগল মাহমুদ। এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকাল সিগন্যালের দিকে। নিকষ অন্ধকার। কে জানে, কখন ট্রেনের আলো দেখা যাবে!

দু-দিনের মধ্যে ফিরবে বলে শিকারে গিয়েছিল আব্দুল্লাহ। চারদিন পার হয়ে যাবার পরও যখন ও ফিরল না, তখন দুর্ভাবনায় পড়ল মাহমুদ। ট্রাঙ্ককল করল শেরপুর থানায়।

থানার কর্মকর্তা সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল্লাহর কোন খবর দিতে পারলেন না। তবে মাহমুদের টেলিফোন নাম্বার টুকে রাখলেন এবং জানালেন, আব্দুল্লাহ-র কোন খবর পেলেই তিনি ঢাকায় ট্রাঙ্ককল করবেন।

'মাহমুদ যখন উদ্বেগে অধীর হয়ে অন্যান্য জায়গায় চেষ্টা করছে আবদুল্লাহর খবর নেবার জন্যে, তখন শেরপুর থানার ও. সি.-র ফোন পাওয়া গেল।

মাহমুদ সাহেব. আপনার ভাই নিরাপদে আছেন। শ্বশুরবাড়িতে

রাজার হালেই তাঁর দিন কাটছে।'

মাহমুদ চমকে উঠেছে। 'তার মানে! গ্রেফতার হয়েছে আব্দুল্লাহ?'

ও.সি. সাহেব হো হো করে হেসে উঠেছেন। 'আরে না, না! উনি গ্রেফতার হবেন কেন? স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন। সত্যিই জামাই আদর ভোগ করছেন। তবে যদি বলেন, তাকে ধরে আনতে পারি এখানে। টেলিফোনে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিতে পারি। আর জানেন তো, আমাদের লোকদের যদি ধরে আনতে বলি, ওরা বেঁধে আনবে।'

অবশ্য তার আর দরকার হল না। আব্দুল্লাহ নিজেই পরদিন ঢাকায় এল। সঙ্গে ওর সদ্য-বিয়ে-করা বউ। 'মাহমুদ, বিয়েটা হঠাৎ হয়ে গেল। রাগ কর না, ভাই। কি করব, বল? অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।'

অ্যাক্সিডেন্টের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেল আরও কিছুদিন পর। লাস্যময়ী সোসাইটি লেডী রাশেদা আহমেদ তাঁর বয়ফ্রেণ্ড আব্দুল জব্বারের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিল। নদীর চরে জব্বার সাহেবের বন্ধু আব্দুল্লাহর সঙ্গে পরিচয় হল হঠাৎ করেই। দুটো ভিন্ন স্রোত একত্র হল যেন। রাশেদা হঠাৎ আবিষ্কার করল, সারাজীবন আব্দুল্লাহর মত একজন পুরুষকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে ও।

আব্দুল্লাহ বারবার আপত্তি জানিয়েছে। 'এ অসম্ভব, রাশেদা। জব্বার আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি না আমি।'

রাশেদা ফুঁসে উঠেছিল। 'তুমি প্রতারণা করছ কোথায়? তুমি শুধু আমাকে নতুন করে বাঁচতে শেখাচ্ছ। প্রতারণার অভিযোগ যদি ওঠে, সে-দায় তো আমার!'

'তোমার দায়কেও আমি অস্বীকার করতে পারি না।'

''আব্দুল্লাহ, তোমার বন্ধু আমার চেয়ে অনেক বড় প্রতারক। সিনেমা বানাবে আর তাতে নায়িকার রোল দেবে—এই প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমিও বড্ড বোকা! কিছু না ভেবে ওর ফাঁদে পা দিয়ে…'

জব্বারের ফাঁদে পা দিয়ে শেরপুরের মত এক মফঃস্বল শহরের অত্যাধুনিকা সমাজসেবী রাশেদা আহমেদের ঠিক কতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, আব্দুল্লাহ জানে না। কিন্তু রাশেদার প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে আব্দুল্লাহর সর্বনাশ হল। আধঘন্টার নোটিশে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে কাজী সাহেবের সামনে হাজির হতে হল ওকে।

রাশেদার বাবা আর. ইউ. আহমেদ ওখানকার ডাকসাঁইটে ব্যবসায়ী। রাশেদার তিন ভাই রাজনৈতিক আর সামাজিক অঙ্গন গরম করে রেখেছে। ওদের কারুর প্রভাব-প্রতিপত্তি কম নয়। ওদের সমবেত চাপের মুখে অন্যান্য বন্ধুরা উৎসাহ যোগাল। কেউ কেউ দায়িত্ব নিল যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজনের। খুব তাড়াহুড়া করে বিয়ে হয়ে গেল আব্দুল্লাহ আর রাশেদার।

আব্দল্লাহ ভুলটা বুঝতে পেরেছে বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই। একদিন টের পেল, রাশেদা গোপনে জব্বারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আব্দুল্লাহর অনুপস্থিতিতে প্রায়ই ওরা একান্ত নিরালায় কথা বলে। সিনেমার নায়িকা হবার স্বপ্ন আবার পেয়ে বসে রাশেদাকে।

আব্দুল্লাহ প্রথম দিকে হতাশায় মুষড়ে পড়ল, কিন্তু বউকে কিছু বলল না। তারপর শুরু হল ছোটখাট বিরোধ, ঝগড়া-ঝাঁটি। একদিন প্রস্তাব দিল, 'ঢাকায় চল। শেরপুরে আর নয়।'

রাশেদা আঁৎকে ওঠে। ঢাকায় গেলে এই অবারিত জীবনের কি হবে? কোথায় পাবে এমন স্বাধীনতা আর আত্মীয়-বন্ধু-ভক্তদের

ছত্রছায়া? শ্বশুরবাড়ির পরাধীন জীবন ওর কাছে অসম্ভব, অবাস্তব মনে হল। জেদ ধরল, ঢাকায় যাবে না ও।

আব্দুল্লাহও ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ততদিনে। 'বেশ, তুমি থাক তাহলে! আমি চললাম।'

সত্যিই ঢাকায় চলে গেল আব্দুল্লাহ। মাহমুদকে জানাল সঙ্কটের ব্যাপারটা। মাহমুদ বলল, 'কাজটা ভাল হচ্ছে না, আব্দুল্লাহ। তুমি বরং শেরপুরেই ফিরে যাও। ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে এস।'

ততদিনে ওরা এক ফুটফুটে মেয়ের বাবা-মা হয়েছে। রাশেদার বাবা অনেক বকাঝকা করলেন। আব্দুল জব্বারও তাঁর পরামর্শমত রাশেদাকে বুঝিয়ে বলল, 'স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি না করে তুমি বরং ঢাকা চলে যাও। ওখানে আমাকে আরও কাছে পাবে। সিনেমায় নামতে হলেও তো তোমার ঢাকায় থাকা চাই!'

রাশেদার ভাই বলল, 'তা ছাড়া রূপার ব্যাপারটাও তোকে ভাবতে হবে। ওকে ভাল স্কুলে দেয়া চাই। ওর ভাল টিউটর দরকার। ঢাকা ছাড়া ওসব কোথায় পাবি? তার চেয়ে আব্দুল্লাহর সঙ্গে আপস করে নে।'

রাশেদা অনেক ভাবল। তারপর একদিন নাটকীয়ভাবে রূপাকে নিয়ে ঢাকার বাড়িতে চলে এল। 'আমার ভুল ভেঙেছে, আব্দুল্লাহ। ফিরে এসেছি তোমার কাছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

সাময়িকভাবে শান্তি ফিরে এল। দুরন্ত, বুদ্ধিমতী মেয়ে রূপা এ-বাড়িতে তার সবচেয়ে আপন আর প্রিয়জন হিসেবে বেছে নিল মাহমুদকে। ওর মনে যত প্রশ্নের উদয় হয়, সবকিছুর উত্তর আছে শুধু "ছোট আব্বার" কাছে। ওর কাছেই রূপার সব আবদার। মাহমুদ নিজেও একটা নতুন জীবন পেয়ে খুব খুশি।

একবার দু-দিনের জন্যে ঢাকার বাইরে গেছে মাহমুদ। রওনা হবার আগে রূপা জেদ ধরল, সঙ্গে যাবে। অনেক বুঝিয়েও যখন নিরস্ত করা গেল না, তখন মিথ্যের আশ্রয় নিল মাহমুদ।

'আচ্ছা, তোমাকে না নিয়ে ঢাকার বাইরে যাব না। এখন শান্ত হয়ে বস। আমি অফিস থেকে ঘুরে আসি।'

রূপার চোখে সন্দেহ ফুটে ওঠে। 'কখন ফিরবে?'

'এই তো···দুপুরের লাঞ্চের আগেই।'

রূপা হাসিমুখে বলল, 'ঠিক আছে, অপেক্ষা করব আমি।'

ট্রেনে চড়ে মাহমুদের মন খারাপ হয়ে গেল। রূপাকে মিথ্যে কথা বলে আসাটা ওর উচিত হয়নি। পরে আবার এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে খিদে লাগলে রূপা ছোট আব্বার কথা ভুলে যাবে আর খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

দু-দিন পরে ফিরে এসে মাহমুদ জানল, রূপা না খেয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। কেউ ওকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, কিছুতেই ভোলেনি মেয়ে। অপরাধবোধে পীড়িত হল মাহমুদ। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল, যখন শুনল, মেয়েটা মায়ের হাতে মার খেয়েছে।

ট্রেন এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। ওয়েটিং রুমের দিকে এগিয়ে যেতেই মাহমুদ দেখল, ওর অপেক্ষায় বসে না থেকে একজন কুলির মাথায় ব্যাগ-স্যুটকেস চাপিয়ে ছুটে আসছে সাদিয়া। বোঝা যায়, ওর তর সইছিল না। প্রতীক্ষা সত্যিই মৃত্যুর চেয়ে বেশি কষ্টকর। মাহমুদ নিজেও এ-ব্যাপারে অত্যন্ত অসহিষ্ণু। অথচ আজ কিভাবে এতটা সময় কেটে গেছে, ও জানে না। মানুষের সবসময় এমন একটা কিছু

থাকা চাই, যা নিয়ে সে গভীর ভাবনায় মগ্ন হতে পারে। এতে তার অসহিষ্ণুতা আর অস্থিরতা—দুটোই কমে যাবে। ঘুণপোকার মত ওই দুটো শত্রু আমাদের জাতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে, ভাবল মাহমুদ।

ট্রেনে টিকেটধারী যাত্রী যত উঠল, তার চেয়ে বেশি জায়গা দখল করল বিনা টিকেটের লোকজন। এদের মধ্যে আবার যারা মাস্তান গোছের, তারা ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া অন্য কোন কম্পার্টমেন্ট পছন্দ করে না। রেলওয়ের গার্ড, টিকেট চেকাররা ওদের মুখ চেনে। খামোকা গোলমালের মধ্যে না গিয়ে ওদের সঙ্গে আপস রফা করে নেয় তারা। চেষ্টা করে কিছু লাভ আদায়ের; সম্ভব না হলেও ক্ষতি নেই।

ফার্স্ট ক্লাসের একটা ছোট কম্পার্টমেন্টে কোনরকমে জায়গা করে নিল মাহমুদ। সাদিয়া জড়োসড়ো হয়ে জানালার পাশে বসল। এক বিশাল বপুর নেতাজী আর সাদিয়া—এই দু'জনের মাঝখানে কষ্টে-সৃষ্টে শরীরটা ঢুকিয়ে বসতে চেষ্টা করল মাহমুদ। কম্পার্টমেন্টের নির্ধারিত আসন মাত্র তিনটে। সেখানে বসেছে পাঁচজন। নেতা গোছের যাত্রীর সঙ্গে দুজন শিষ্য আছে। মাহমুদ জানে, ওরা টিকেট কাটেনি। বিনা টিকেটে যদি যাওয়া যায়, লোকে টিকেট কাটবে কেন? সবাই কি মাহমুদের মত বোকা?

নেতা শিষ্যদের তোয়াজ শুনতে শুনতে ধূমপানের নেশা বোধ করল। মাহমুদ সবিনয়ে বলল, 'দরজা-জানালা বন্ধ। তা ছাড়া একজন মহিলা যাত্রীও আছেন। সিগারেটটা না ধরালে হয় না?'

নেতা যেন বিস্ময়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এমন অসম্ভব আবদার কেউ কখনও তার কাছে করেনি। শিষ্যরা গর্জে উঠল। 'কাকে কি বলছেন, মিয়া? ওনাকে চেনেন?'

মাহমুদ তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই।

চালিয়ে যান আপনারা। সাদিয়া, তোমার পাশের শার্সিটা খুলে দাও।'

সাদিয়া জানালার কাচ তুলে মাথা বাইরে ঝুলিয়ে রাখল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সে-ও ভাল। মাহমুদ গুণ্ডাগুলোর কথার প্রতিবাদ না করে নিজেদের অসুবিধেটাই মেনে নিয়েছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাদিয়া। কোন লাভ নেই প্রতিবাদ করে। প্রবল প্রতাপের সঙ্গে ওরা রাজত্ব করছে সমাজে। পেশী আর অস্ত্রের শক্তির কাছে হেরে গেছে মানুষের নীতিবোধ আর সততার শক্তি।

অন্ধকার ফুঁড়ে ট্রেন ছুটছে। মাঝে মাঝে আলোর ঝলকানি দেখা যায় বিদ্যুচ্চমকের মত, তারপর আবার অন্ধকার। ট্রেনটা ময়মনসিংহ জংশন ছেড়েছে রাত বারোটার দিকে। যদি আর দেরি না হয়, আড়াইটা নাগাদ ঢাকায় পৌঁছবে, আশা করা যায়। কিন্তু এত রাতে কমলাপুর স্টেশনে গাড়ি পাওয়া যাবে কিনা কে জানে!

এরপর যে-ভাবনা মাহমুদকে সবচেয়ে বিব্রত করছে, তা হল, ঢাকায় সাদিয়ার রিসেপশনটা কেমন হবে! রাশেদা ভাল ব্যবহার করবে না, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু রূপা ব্যাপারটা কিভাবে নেবে—এটাই সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। নিশ্চয়ই ওরা কেউ কখনও কল্পনা করেনি, মাহমুদ এমন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে! রূপা অবাক হবে, হয়ত আড়ষ্ট হবে নতুন অতিথির সামনে। হয়ত ওর সঙ্গে যে-ঘনিষ্ঠতা আছে রূপার, তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে না। সম্পর্কটা স্বাভাবিক হতে সময় নেবে। মাহমুদ তার জন্যে প্রস্তুত আছে।

রাশেদার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা বাদ দিলেও চলে। রাশেদা বিয়ের পর থেকেই এ-পরিবারের জন্যে একটা সমস্যা। একটার পর একটা সমস্যা তৈরি করে চলেছে সে। কেউ কেউ বলে, আব্দুল্লাহর

অকাল মৃত্যুর পেছনেও তার হাত আছে। হয়ত ধারণাটা অমূলক। কিন্তু রাশেদার অহঙ্কার, স্বার্থপরতা আর লোভের ব্যাপারটা বিবেচনা করলে তাকে ক্ষমা করা যায় না।

আব্দুল্লাহ যখন ওকে ঢাকায় নিয়ে এল, তখন থেকেই রাশেদার এই জটিল, কুটিল চরিত্রের সঙ্গে ওদের পরিচয়। এরপর যখন জানা গেল, আব্দুল জব্বারের সঙ্গে অতি গোপনে যোগাযোগ রাখছে রাশেদা, হতাশায় মুষড়ে পড়ল খান পরিবারের সবাই। আব্দুল্লাহকে কেউ কখনও এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি। কিন্তু সবই জানত ও। রাশেদার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা বরাবরই ছিল বিচিত্র। ওদের মধ্যে বিবাদ হত প্রায়ই। মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়ি হবার উপক্রম হত। কিন্তু সমঝোতায় পৌঁছতেও দেরি হয়নি কখনও।

রূপা টের পেত, কখন ওর বাবা-মায়ের ঝগড়া তুঙ্গে উঠবে। ছুটে এসে তখন ও আশ্রয় নিত মাহমুদের কোলে। 'জান, ছোট আব্বা, আবার এক চোট হয়ে যাবে।'

মাহমুদ হেসে ওর গাল টিপে দিত। 'কি করে জানলি?'

'দুজনেই খুব ফুঁসছে। যে-কোন মুহূর্তে লড়াই শুরু হয়ে যাবে।'

মৃদু ধমকের সুরে মাহমুদ বলত, 'থাম, ডেঁপো মেয়ে। অল্প বয়সে এত কথা বুঝতে নেই। বাবা-মায়েরা অমন করেই থাকে।'

ঠোঁট ফুলিয়ে রূপা বলত, 'বললেই হল? আমার বন্ধু—পুটু, টুনি, এলিজাবেথ, রানা···ওদের তো তুমি চেন! ওদের সবার বাবা-মা আছে। তারা কেউ অমন রাগারাগি করে না। মা যখন রেগে যায়, তখন তাকে দেখেছ, ছোট আব্বা? চোখ দুটো এইরকম গোলগোল হয়ে যায়···যেন ড্রাগনের মুখ···মনে হয় আগুন বেরিয়ে পড়বে।'

মাহমুদ রূপাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পায় না। রূপা বলত,

'তোমার যদি একটা বউ থাকত, ছোট আব্বা, সে কি অমন ঝগড়া করত তোমার সঙ্গে? সত্যি করে বল তো?'

মাহমুদ চোখ বুজে চিন্তিত হবার ভান করত। 'কে জানে! হয়ত তা-ই করত।'

রূপা কিল পাকিয়ে বলত, 'ইস! বললেই হল? সেই মেয়েলোকটাকে ঠেঙিয়ে বার করে দিতাম। আচ্ছা, ছোট আব্বা, তুমি বিয়ে করবে না?'

আট বছরের রূপাকে বিয়ের সমস্যার কথা বোঝাতে গিয়ে হিমসিম খেত মাহমুদ। তারপর রণে ভঙ্গ দিয়ে বলত, 'চল, মার্কেটে যাই। কি নেবে আজ? পুতুল না কমিক্স্?'

রাশেদা নায়িকা হতে চেয়েছিল। সম্ভবত জব্বার ওকে একটা নতুন নামও দিয়েছিল—নবীনা। কিন্তু জব্বারের ছবি যখন এফডিসি'র ফ্লোরে ঢুকল, তখন রাশেদাকে প্রবীণা বলে ডাকা চলে। মেঘমালার মত কেশরাশির ফাঁকে দু-একটা সাদা চুল উঁকি দিতে শুরু করেছে। ত্বকেও পড়েছে বাড়তি ভাঁজ। হয়ত আব্দুল্লাহর মৃত্যুও ওর বার্ধক্য ত্বরান্বিত করেছে।

রাশেদা আর নায়িকা হতে পারবে না। কিন্তু আব্দুল জব্বার রাশেদার সঙ্গ ছাড়েনি। নতুন টোপ দিয়েছে, 'রূপাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। ওকে দেশের এক নাম্বার নায়িকায় পরিণত করব। তোমার আর কোন চিন্তা নেই। দেবরের ওপর নির্ভরশীল হবার কি দরকার? তোমার নিজেরই যে সম্পদ আছে, তা ভাঙিয়ে রানীর হালে থাকতে পার।'

রাশেদা মৃদু আপত্তি তুলেছে। 'রূপা কি রাজি হবে? ও তো "ছোট আব্বা"-র নামে অজ্ঞান। মাহমুদ যা বলে, তা-ই শুনবে মেয়েটা।

আমাকে একটুও পাত্তা দেয় না।'

অধৈর্য হয়ে জব্বার বলেছে, 'বাট দেন···রূপা তোমারই মেয়ে! চাচার খপ্পর থেকে ওকে বার করে আন। ওই মেয়ের রূপ আগুনের মত। ওকে নায়িকার রোল দিলে ছবি সুপারহিট হবেই, দেখে নিও।'

'মাহমুদ ওকে লেখাপড়া শেখাতে চায়। বিদ্যের জাহাজ হবে ও।'

'হুঁ!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জব্বার বলেছে, 'তারপর কলেজে কিংবা স্কুলে ছেলে ঠেঙিয়ে কায়ক্লেশে পেট চালাবে! যৌবন না ফুরাতেই চোখে লাগাবে হাই পাওয়ারের চশমা! বাহ্!'

রাশেদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, 'তাহলে কি করব?'

জব্বার অনেক ভেবে বুদ্ধি বাতলে দিয়েছে। একদিন দেবরের মুখোমুখি হয়েছে রাশেদা। 'একটা কথা ছিল, মাহমুদ।'

'বল।'

'আমি আর কতদিন মেয়েকে নিয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকব?'

বিষম অবাক হল মাহমুদ। হাসিও পেল। 'কে বলল, তুমি আর তোমার মেয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসে আছ? আমাদের যৌথ সম্পত্তি। যত ব্যবসা, সবই আমাদের দুজনের। সেই সূত্রে তুমি ন্যায্যভাবে এ-সম্পত্তি আর ব্যবসার একাংশের উত্তরাধিকারী। তুমি তো আমার দয়ার ওপর নির্ভরশীল নও, ভাবী।'

'কিন্তু···তুমিই এখন সবকিছুর প্রকৃত মালিক। আমার অংশটাও তোমাকে দেখতে হচ্ছে। বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে তোমাকে। এটা তো আমাকে করুণা করারই সামিল।'

মাহমুদ শূন্য দৃষ্টিতে রাশেদার দিকে তাকিয়ে রইল। রাশেদা শাড়ির কোণা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'অন্যের বোঝা তুমি আর

কতদিন টানবে?'

মাহমুদ বলল, 'আমি কি কখনও এমন কিছু বলেছি বা করেছি, যাতে তুমি বিব্রত হতে পার? কেন এসব উদ্ভট ভাবনায় সময় নষ্ট করছ? আমি মোটেই তোমাদের করুণা করছি না। তোমরা পূর্ণ মর্যাদায়, উপযুক্ত অধিকার নিয়েই এখানে আছ। যদি কেউ তোমাকে অন্য রকম কিছু বলে থাকে, ধরে নিও, তার উদ্দেশ্য ভাল নয়।'

যেন দেশলাইয়ের কাঠির মত জ্বলে উঠল রাশেদা। 'আসলে তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়, মাহমুদ। তাই তুমি আমাকে অকারণ সন্দেহ করছ।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মাহমুদের মুখ। 'তোমাকে সন্দেহ করছি! আমার উদ্দেশ্য ভাল নয়! এসব কি বলছ তুমি?'

'আমি কচি খুকি নই, মাহমুদ।'

মাহমুদ সমান ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'মোটেই না। বেশ কিছু চুল পেকেছে, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার বুদ্ধি একটুও পাকেনি, ভাবী। তোমার ভালর জন্যেই বলছি, অন্যের বুদ্ধিতে চলা বন্ধ কর। আমি তোমার শত্রু নই। তুমি তা ভালভাবেই জান।'

রাশেদা একগুঁয়ের মত বলল, 'আমি সব জানি, বুঝি। তুমি আব্দুল জব্বারের ব্যাপারে ইঙ্গিত করছ। আগেও এ-চেষ্টা করেছ তুমি। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কোন হস্তক্ষেপ পছন্দ করি না আমি।'

মাহমুদ হাসল। 'কথাটা আমি তুলিনি, ভাবী। তুমিই শুধু শুধু আমার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছ।'

'নিশ্চয়ই তার কারণ আছে।'

'কারণটা জানতে পারি কি?'

'ওসব কথা থাক, মাহমুদ। আমি কারও দয়ার ওপর নির্ভর করতে চাই না, কারও সঙ্গে ঝগড়া করারও ইচ্ছে নেই।'

'তাহলে তোমার ইচ্ছের কথাটা বলে ফেল।'

রাশেদা অনেকক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, 'আমি আর এ-বাসায় থাকব না। আমার যা পাওনা আছে, বুঝিয়ে দাও। গুলশানে আলাদা বাসা বাড়া নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সামনের সপ্তায় আমরা সেখানে চলে যাব।'

'সেখানে কে তোমাদের দেখাশোনা করবে? আব্দুল জব্বার?'

রাশেদা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। 'দ্যাট্স্ নান্ অভ ইওর বিজনেস্!'

মাহমুদ বলল, 'বেশ, যেতে পার তুমি।'

রাশেদা বলল, '"আমি" নই, "আমরা"।'

'উঁহুঁ, ওটি হচ্ছে না। রূপা এখনও প্রাপ্তবয়স্কা হয়নি। ওর আঠার বছর পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত ওর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমার। ও আমাদের বাড়ির মেয়ে।'

'তারপর?'

'আঠার বছর পূর্ণ হবার পর রূপা এ-ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে। ইচ্ছে করলে এখানে থাকতে পারে, তোমার কাছে যেতে চাইলে যাবে। এমনকি একেবারে আলাদা, তৃতীয় কোন জায়গায়ও থাকতে পারে। কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু এখন আমি ওই ফুলের মত মেয়েকে উচ্ছন্নে যেতে দিতে পারি না।'

'এসব কি বলছ, মাহমুদ?' রাশেদা গর্জে উঠল।

মাহমুদ শান্ত সুরে বলল, 'আইন আর যুক্তির কথা বলছি। তোমার অন্য কোন কথা থাকলে বলতে পার। সম্পত্তি আর ব্যবসার হিসেব কবে বুঝে নিতে চাও?'

'আমার সবচেয়ে বড় সম্পত্তি রূপা। ও আমার পেটের মেয়ে। ওকে নিয়ে যাব আমি। বাধা দিতে এস না, মাহমুদ। ভাল হবে না।'

মাহমুদ হেসে বলল, 'কিসে ভাল আর কিসে মন্দ হবে, আমি জানি, ভাবী। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ভয় দেখিও না। রূপার আশা ছেড়ে তুমি যেখানে খুশি যেতে পার। সব নরকের দরজাই তোমার জন্যে খোলা। খান পরিবারের এই রত্নটিকে নিয়ে টানাটানি কর না। আইন তোমার পক্ষে নেই। বিশ্বাস না হলে উকিলের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার।'

মাহমুদের মনে পড়ে, সেদিন অতি চমৎকার অভিনয় করেছে রাশেদা। সুযোগ পেলে সত্যিই সে বিখ্যাত অভিনেত্রী হতে পারত। সন্তান স্নেহে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েছিল যেন। মাহমুদ জানে, আব্দুল জব্বারের সঙ্গে আলোচনা না করে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না রাশেদা।

দু-দিন পরেই জব্বার এল। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'তোমার দেবরটা মহা ধুরন্ধর। ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল।'

'তবু তো একটা পথ বার করতে হবে।'

জব্বার একটু ভেবে বলল, 'একটু অপেক্ষা কর। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে জানাব তোমাকে।'

আরও কিছুদিন কাটল। রূপা অসহায়ভাবে ছটফট করে বেড়ায়। গভীর মনোযোগে মা আর জব্বার চাচার কথাবার্তা শোনে। তারপর মাহমুদের কাছে বসে কেঁদে ভাসায়।

'ছোট আব্বা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

'না, বেটি। তোমাকে আমি যেতে দেব না। তুমি এখানে

থাকবে। লেখাপড়া শেষ করবে। যখন বড় হবে, তখন সিদ্ধান্ত নেবে নিজের ব্যাপারে। এখন কেউ তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।'

আব্দুল জব্বার শেরপুরে গেল। খুশিতে ডগমগ হয়ে ফিরে এল। পরামর্শ করল উকিলের সঙ্গে।

এরপর উকিলের বুদ্ধি নিয়ে রাশেদার কাছে হাজির হল আব্দুল জব্বার। সারাদিন ধরে ফিসফিসানি চলল রাশেদার সঙ্গে। পরদিন সেজেগুজে বেরিয়ে গেল রাশেদা। মাহমুদের কর্মচারী জানাল, রাশেদা ম্যাডামকে আদালতের বারান্দায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

কাটল আরও কয়েকটা দিন। একদিন সকালে সমন এল আদালত থেকে। মিসেস রাশেদা আহমেদ ফরিয়াদ জানিয়েছেন, তাঁর কন্যাকে অবৈধভাবে আটকে রাখছে জনৈক মাহমুদ খান। তিনি কন্যাকে ফেরত চান; শাস্তি চান অবৈধ আটককারীর। মাহমুদ যদি স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির না হয়, ওকে গ্রেফতার করা হবে।

হতভম্ব মাহমুদ আদালতে হাজির হল। কিন্তু শুনানী হল না ওই দিন। মাহমুদের কৌসুলী ওর জামিনের আবেদন জানালেন। আবেদন মঞ্জুর হল।

বেশ কয়েকদিন পর শুনানী হল। "যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বিনা মিথ্যা বলিব না"—এইসব শপথবাক্য আউড়ে রাশেদা বিচারক আর আদালত ভর্তি মানুষের সামনে বলল, মাহমুদ তার কেউ নয়। আব্দুল্লাহ শুধু তার বন্ধু ছিল, কখনই বিয়ে হয়নি ওর সঙ্গে। রূপার বাবা নয় সে। তাই রূপাকে আটকে রাখার কোন অধিকার নেই মাহমুদের। রাশেদা তার প্রিয় কন্যার মুক্তি চায়, এ-ব্যাপারে মহামান্য আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করে আর অন্যায়ভাবে যে ওই

কিশোরীকে আটকে রেখেছে, তার শাস্তি চায়।

মাহমুদের উকিল এগিয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে। পনের মিনিট আরগুমেন্ট করলেন। খণ্ডন করতে চেষ্টা করলেন প্রতিপক্ষের কুযুক্তিগুলো। আদালত কক্ষ সরগরম হয়ে উঠল।

শুনানী, জেরা, সব শেষ হল। নতুন দিন ধার্য হল রায়ের জন্যে। বিচারক রায় দিলেন, দুটো শর্ত সাপেক্ষে রূপা মাহমুদের কাছে থাকতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাহমুদ। গফর গাঁও স্টেশনে ট্রেন থামল। নেতা আর তার শিষ্যরা নেমে গেল। সাদিয়া জানালার শার্সি বন্ধ করল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন।

মাহমুদ রূপার কথা ভাবছে। দুটো শর্ত পালন করতে পেরেছে মাহমুদ। আইনগত ঝামেলা হয়ত মিটেছে। কিন্তু পারিবারিক সমস্যা তার চেয়েও জটিল। সে-সমস্যা সমাধানের জন্যে সাদিয়াকেই এগিয়ে আসতে হবে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে ওকে তার আগে রূপা সম্পর্কে কিছু কথা জানান দরকার ওকে।

মাহমুদ সাদিয়ার মুখোমুখি বসে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে আলাপ আছে। হয়ত পরে আর সুযোগ পাব না।'

সাদিয়া নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকাল। 'বলুন।'

ছয়

গভীর রাতের ঢাকা শহর এমন হতে পারে, সাদিয়া আগে ভাবেনি। দেখে মনে হয়, গোটা শহরে কার্ফু আইন জারি করা হয়েছে। পুলিসের তাড়া খেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে আছে লোকজন; কার্ফু শিথিল হলেই আবার বেরিয়ে আসবে দলে দলে। রাস্তায় বাতিগুলো জ্বলছে। শেয়াল-কুকুরের দেখা নেই, ঝিঁঝিঁর গানও শোনা যায় না। মাঝে মাঝে টহল দিচ্ছে পুলিসের গাড়ি। মোড়ে মোড়ে ঢুলছে কিংবা সিগারেট ফুঁকছে সেপাইরা।

কোত্থেকে যেন গানের সুরও ভেসে আসছে! উৎকর্ণ হল সাদিয়া। দূরের কোন সুর ওকে নেশাতুর করে তোলে। নস্টালজিয়ায় উন্মনা হয়ে যায় ও। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল গানের কথাগুলোঃ

"কান্দো কেনে মন রে আমার, কান্দো কেনে মন?
আন্ধার আলোর এই যে খেলা, এই তো জীবন!..."

চমৎকার! সাদিয়ার মনের ভার কমে যাচ্ছে। ও দেখতে পেল, একটা গ্যারেজের ভিতর আলো জ্বেলে গাড়ি মেরামতের কাজ করছে

কয়েকজন মিস্ত্রি। অন্য একজন পাশে বসে তাস খেলছে। ওদেরই একজনের কাছে ক্যাসেট রেকর্ডার আছে। তাতে বাজছে হেমন্তর গাওয়া ওই গান।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই অস্পষ্ট হয়ে গেল কলিগুলো। মনে হল, ওর সঙ্গে যদি অন্য কেউ না থাকত, রিকশা থামাত।গানটা শুনত প্রাণভরে। চলার পথে চেনা গানের কলি শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ান সাদিয়ার ছোটকালের অভ্যাস। এ-নিয়ে মা-বাবার কাছে অনেক বকুনি খেয়েছে ও। একবার এগ্‌জিবিশন দেখতে গিয়েছে ওঁদের সঙ্গে। হঠাৎ একটা স্টলের সামনে ওঁরা সভয়ে লক্ষ করলেন, সাদিয়া সঙ্গে নেই। পাগলের মত খুঁজে ফিরতে লাগলেন ওঁরা। অনেকক্ষণ পরে দেখলেন, একটা রেস্তোরাঁর সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গান শুনছে সাদিয়া।

সাদিয়া মনে মনে আওড়াল, 'কান্দো কেনে, মন রে আমার!'

অনেক চওড়া চওড়া রাস্তা, মোড় আর আকাশছোঁয়া ঘরবাড়ি পার হয়ে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর রিকশা এসে দাঁড়াল ধানমণ্ডির একটা আধুনিক বাড়ির সামনে। গেটের দু-পাশে লাইট জ্বলছে। কাচের ওপর রোড আর বাড়ির নাম্বার লেখা। তার নিচে চিঠি ফেলার বাক্স।

চিঠির বাক্সের গায়ে একটা সুইচে আঙুল বসাল মাহমুদ। বাড়ির ভিতর তীব্র শব্দে আর্তনাদ করে উঠল একটা কলিং বেল। সাদিয়া ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটা বাজে। ভোর হয়ে এসেছে। একটু পরেই আজান শোনা যাবে। ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর। চারদিকে গিজগিজ করছে মসজিদ। ভোরের নীরবতা চুরমার করে একসঙ্গে আট-দশটা মসজিদ থেকে যখন আজান হতে থাকে, তখন সত্যিই রাগ হয়। একবার ঢাকায় এসে কয়েকদিন কাটিয়েছে সাদিয়া। ব্যাপারটা ওর একটুখানি চাওয়া

একটুও পছন্দ হয়নি। আজান কি পাল্লা দিয়ে জাহির করার মত জিনিস? ওর বাবা আজান দিতেন শেরপুরের মসজিদে। সে-শব্দ যতদূর যেত, অন্য কেউ তার মধ্যে স্বর তুলে বিঘ্ন সৃষ্টি করত না।

বারতিনেক বেল বাজানর পর বার-তের বছরের একটা ছেলে এসে গেটে উঁকি দিল। তারপর অতি কষ্টে চোখ কচলে ঘুম তাড়াল। গেট খুলে বলল, 'সালাম, ছোট স্যার। মালপত্র আমারে দ্যান।'

হঠাৎ সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বিষম চমকে ওঠে ও। সাদিয়া ভেবেছিল, রাস্তায় দাঁড়িয়েই বুঝি সে ওর পরিচয় জানতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ছেলেটি সেসব কিছুই করল না। মালপত্র কাঁধে নিয়ে ছুটল বাড়ির ভিতর। মাহমুদ রিকশার ভাড়া মিটিয়ে মোটা অঙ্কের বখশিশ দিল। তারপর সাদিয়ার হাত ধরে বলল, 'আসুন। এ-ই আমার গরিবখানা।'

সাদিয়া ইট-বিছান পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সুন্দর বাড়িটা।'

মাহমুদ বলল, 'বাড়ির লোকজন কিন্তু একটুও ভাল নয়, আগেই বলেছি। আমিও লোকটা সুবিধের নই। কিন্তু···তার জন্যে আপনার অসুবিধে হবে না। আপনার কাজ শুধু রূপার দেখাশোনা করা।'

সাদিয়া কিছু বলল না।

প্রশস্ত বারান্দার তিনদিকে রেলিং, রেলিং-এর নিচে অনেক টব। সুন্দর সুন্দর গাছে ভরে আছে বারান্দাটা। এক পাশে কয়েকটা বেতের চেয়ার, টেবিল আর টিপয়।

বারান্দার শেষ প্রান্তে কাচের দরজা। দরজার গায়ে ছোট ছোট, আঁকাবাঁকা হরফে লেখা—হোম, সুইট হোম।

সাদিয়া হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, কার প্রিয় নিবাস এটা? সত্যি

মাহমুদের? গত তিনদিনে তেমন কিছু বোঝা যায়নি। একবারও বাড়ির প্রতি মমতার কথা প্রকাশ করেনি লোকটা। যাদের মন শক্ত, তারা কখনও হোমসিক হয় না। এরা কাজের লোক। সাহসী। কিন্তু একটা বিপদও আছে এ-ধরনের লোক নিয়ে। এরা নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। কাউকে প্রচণ্ড আঘাত করতে এদের বাধে না।

কাচের দরজা খুলে 'সুইট হোমের' ভিতরে পা দিয়ে তিক্ত অভ্যর্থনার স্বাদ পেল সাদিয়া। মাঝবয়েসী এক শ্যামলা মহিলা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। শরীরের কাপড় অসম্বৃত। চোখদুটো ছোট হতে হতে প্রায় মিশে গেছে ভুরুর সঙ্গে। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তার জোড়া ভুরু। সিঁটকে আছে নাক। তবু তাকে চিনতে পেরেছে সাদিয়া।

'লালু তো ঠিকই ধরেছে, দেখছি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মহিলাটি।

মাহমুদ পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি আমার ভাবী। আব্দুল্লাহর বিধবা বউ। ভাবী, এর নাম সাদিয়া। শেরপুরের...'

রাশেদা বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, আর বলতে হবে না।'

সাদিয়া ওকে সালাম করার জন্যে পা বাড়াতেই ঘুরে দাঁড়াল রাশেদা। 'আমি ওদের কেউ নই। খামোকা কষ্ট করে আমাকে সালাম করার দরকার হবে না।'

মাহমুদ শান্ত গলায় বলল, 'ভোরবেলায় তোমাদের ঘুম ভাঙাতে হল। কি করব, বল? জামালপুরেই ট্রেনটা দু-ঘন্টা লেট ছিল। পথে আরও দেরি করেছে। গফরগাঁওয়ে আধঘন্টা আর টঙ্গীতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।'

'স্টেশনে নেমে ফোন করলেই তো পারতে! গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। কষ্ট করে রিকশায় আসার কি দরকার ছিল?'

মাহমুদ হাসল। 'ভাবলাম, এমন অসময়ে ড্রাইভারদের

ডাকাডাকি করার মানে হয় না। তা ছাড়া এতে তোমাদের ঘুম ভাঙত আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে।'

'উঁহুঁ। আসল কথায় এস, মাহমুদ। লোকের কাছে বলে বেড়াতে পারবে যে রাশেদা এ-বাড়ির সবকিছু একাই ভোগ-দখল করছে। নতুন বউকে নিয়ে রিকশায় চড়তে হয়েছে তোমাকে। রাশেদা এই শীতের রাতে গাড়িটাও পাঠাতে চায়নি। তোমাদের চালাকি আমি বুঝি না?'

মাহমুদ রাশেদার কথার উত্তর দিল না। লালুকে ডেকে বলল, 'আমার ঘরে আরও দুটো বালিশ চাই।'

লালু সোৎসাহে বলল, 'অখ্খনই আইন্যা দিতাছি, ছোট সার্।'

ড্রইং রূমের সোফায় সাদিয়াকে বসিয়ে মাহমুদ এগিয়ে গেল রাশেদার দিকে। যেসব তিক্ত কথা বলেছে রাশেদা, তার কিছুই যেন ওর কানে ঢোকেনি। স্বাভাবিক মেজাজে মাহমুদ বলল, 'রূপা কোথায়?'

রাশেদা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওর খবরে তোমার কাজ কি? ওর খোঁজ নেবার সময় এখনও আছে তোমার?'

মাহমুদের স্বরে এতক্ষণে দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে। 'যা জানতে চাই, তা-ই বল। রূপা কোথায়?'

'আব্দুল জব্বার ওকে নিয়ে যায়নি। এখনও তোমার জিম্মাতেই আছে। ঘুমোচ্ছে। তোমার···সরি···তোমাদের আসার খবর পেয়েছে। কিন্তু ওঠার ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।'

রাশেদা হনহন করে হেঁটে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মাহমুদকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সাদিয়া একা বসে রইল মস্ত ড্রইং রূমে। বড় জায়গায় একাকিত্বটা ভয়ানক লাগে। সাদিয়া জানত,

ঢাকায় মাহমুদের যৌথ পরিবারে ওর আগমনকে কেউ সুনজরে দেখবে না। মাহমুদ এ-ব্যাপারে আগেই ওকে বুঝিয়ে বলেছে। তবু এ-ধরনের অভ্যর্থনা ওকে হতাশ করল। কেঁদেই ফেলত, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় তার হাত থেকে বেঁচে গেল। জয়েনউদ্দীন কাজী বলতেন, 'বাঙালী কোন নতুন জিনিস চট করে গ্রহণ করতে চায় না। আপদ মনে করে জিনিসটাকে। স্কুলে নতুন ছাত্র এলে তাকে নাজেহাল করে পুরনো ছাত্ররা। অফিসে যোগ দিয়ে নতুন কর্মচারী কারও সাহায্য পায় না। নতুন আদর্শ, বিশ্বাস, এমনকি তথ্যগুলো পর্যন্ত এড়িয়ে চলতে চায় সবাই। একবার নিয়ম পাল্টে দেখ, লোকে তোমাকে মারার জন্যে তেড়ে আসবে। নতুন রাস্তায় হাঁটতে ভয়। নতুন খাবার হোটেলে বিক্রি হয় না।'

হয়ত পৃথিবীর সব পশ্চাৎপদ জাতির অবস্থাই এ-রকম, ভাবল সাদিয়া।

ভোর হয়ে এসেছে। মাহমুদ কোথায়? নিজের মনেই এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল সাদিয়া। ও গেছে শোবার ব্যবস্থা করতে।

ওই মানুষটার সঙ্গে বন্ধ ঘরে শুতে যেতে হবে ভেবে মনে মনে শিউরে উঠল সাদিয়া। এতক্ষণ এসব মনে হয়নি। হয়ত বাইরের পৃথিবীটা বড় ছিল। এখন ছোট হয়ে আসছে।

সবটাই অভিনয়। এক অদ্ভুত খেলা। তবু সাদিয়া অনুভব করল, ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শুকিয়ে গেছে গলা। একটু পানি পেলে ভাল হত। কিন্তু কার কাছে চাইবে? কেউ নেই আশেপাশে।

মাহমুদ কাছে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'এস, সাদিয়া।'

সাদিয়া দেরি না করে উঠে পড়ল। মাহমুদের হাতে হাত রেখে এগিয়ে গেল। দুটো কামরার পর একটা প্যাসেজ। তারপর মাহমুদের

কামরা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পনের-ষোল বছরের এক মেয়ে। টানাটানা, মায়ায় ভরা দুটো উজ্জ্বল, কালো চোখ। কিন্তু হঠাৎ অসময়ে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে বা অন্য যে-কোন কারণে হোক, সে-চোখজোড়ায় এখন খেলা করছে এক অদ্ভুত রহস্য, নির্দয় নির্লিপ্ততা।

'এই যে, রূপা,' শান্ত সুরে মাহমুদ বলল, 'ইনি তোমার চাচী। "ছোট আম্মা" বলে ডাকতে পার।'

থমকে দাঁড়াল সাদিয়া। ষোল বছরের একটা মেয়ের মা হবার বয়স হয়নি ওর। কিন্তু লজ্জা পাবার অবকাশ পেল না, তার আগেই পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল।

বেশ কড়া ধমকের সুরে মাহমুদ বলল, 'কি হল? সাধারণ ভদ্রতার কথাও ভুলে গেছ?'

রূপা তীক্ষ্ণ চোখে মাহমুদের দিকে তাকাল। তারপর সাদিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

'ওভাবে নয়, রূপা।'

রূপা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। প্রচণ্ড অপমান বোধ করছে ও। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। চিবুক যখন বুকে ঠেকল, তখন হঠাৎ মাথা উঁচু করে মাহমুদের দিকে তাকাল। একরাশ চুল সজোরে দুলে উঠে ওর বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের সঙ্গে একাত্ম হল। শরীরের ওপরের অংশ নিচু করে কোমরের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণ তৈরি করতেই রূপা বাধা পেল। সাদিয়া ওর দু-হাত আঁকড়ে ধরে বলল, 'থাক, রূপা। কষ্ট করার দরকার নেই। আমি জানি, তুমি খুব ভাল মেয়ে।'

রূপা বিরক্তি চেপে রেখে বলল, 'কথাটা যদি আপনার হাজব্যাণ্ডের কাছ থেকে শুনে থাকেন, তো বিশ্বাস করবেন না। আমি মোটেই

সুবিধের মেয়ে নই। এখন আমার ভাল-মন্দ ভেবে মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।'

পথ থেকে সরে দাঁড়াল রূপা। সাদিয়ার হাত ধরে ঘরে ঢুকল মাহমুদ। সশব্দে দরজা বন্ধ করল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে রাগটা দমন করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বেতের সোফার দিকে।

'বসুন,' খাটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল মাহমুদ। 'আপনি খুব ক্লান্ত। ভেবেছিলাম, এ-বাড়িতে আপনার উষ্ণ অভ্যর্থনা না জুটলেও তিরস্কার জুটবে না। কিন্তু···কি করব, বলুন? মা-মেয়ে মিলে বেশ কায়দামত অপমান করল আমাদের।'

সাদিয়া জানালার একটা পাল্লা খুলে বাইরে তাকাল। আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। দূরে, লেকের পাড়ে জমেছে হালকা কুয়াশা। বেশ ভাল লাগছে। ওর মন হালকা হল।

হেসে বলল সাদিয়া, 'সব বিয়েতেই কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এমন "হঠাৎ বিয়ের" বেলায় তো ঘটবেই! আমি কিছু মনে করিনি। আপনিও ভুলে যান।'

মাহমুদও হাসল। 'আপনার ঔদার্যের তুলনা হয় না।'

'বাজে কথা। আমি উদার নই। বাইরের সবার সামনে তো আমি অভিনয় করছিলাম! ধরে নিয়েছি, সেখানে যা যা ঘটেছে, সব অভিনয়। এখন বাস্তব জীবন, মানে, বন্ধ ঘরের মুহূর্তগুলো সুন্দর হলেই বেঁচে যাই।'

মাহমুদ উঠে সাদিয়ার পাশে দাঁড়াল। 'সেটা আসলে আপনার ওপরই নির্ভর করে। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকব। আমার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কোথাও কোন ছন্দপতন ঘটবে না।

আপনি কখনও অপমানিত হবেন না। আমার কারণে বিব্রত হতে হবে না আপনাকে।'

সাদিয়া হঠাৎ বলল, 'কি সুন্দর কুয়াশা নেমেছে, দেখুন।'

মাহমুদ অনেকক্ষণ লেকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'মানুষের জীবন অনেকটা ওই প্রকৃতির মতই। কখনও রোদের মত আনন্দময়, কখনও কুয়াশার মত বিষণ্ন।'

সাদিয়া বলল, 'থাক এসব কঠিন কথা। আপনি শুয়ে পড়ুন। বিশ্রাম নিন। আপনার ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ধকল গেছে।'

'খাটটা আপনার।'

অবাক হয়ে সাদিয়া মাহমুদের দিকে তাকাল। 'তা হলে আপনি...!'

মাহমুদ বলল, 'পাশেই একটা ঘর আছে। মাঝখানের ওই দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া চলবে। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করলেই দুজন বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ওখানে বিছানার ব্যবস্থা করতে একটু দেরি হবে। আজকের মত আমি সোফাটাকেই বিছানা বানাব।'

সাদিয়া বাধা দেবার জন্য হাত বাড়াল। শক্ত হাতে ওর হাত ধরে ফেলল মাহমুদ। 'যেখানে যেটা মানায়, সেখানে সেটা রাখাই ভাল।'

সাদিয়া জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, দুটো বালিশ সোফার ওপর পেতে আধশোয়া হয়ে বসে আছে মাহমুদ। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে লোকটাকে। ভীষণ দুঃখী মনে হচ্ছে। লোকটা কোন ভুল করে বসেনি তো? যার জন্যে চুরি করল, সে-ই যদি চোর বলে, ওর দুঃখের সীমা থাকবে না। রূপার আচরণ দেখে মনে হল, মায়ের মত সে-ও মাহমুদের বিয়েতে খুশি হয়নি। রূপা আসলে কি চায়?

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল মাহমুদ। সাদিয়া আবার একা। ঘরের সবটা খুঁটিয়ে দেখল ও। এ-ই বাসর ঘর! ওই যে, ওখানে ঘুমিয়ে আছে ওর স্বামী। একে বলা হয়েছে "ম্যারেজ অভ্ কনভিনিয়েন্স"। আসলে বিয়ে মানেই বিয়ে। গোলাপকে যে-নামে ডাক, গন্ধ বিতরে। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কতদিন বিবাহিত জীবনের অভিনয় করতে পারবে, সাদিয়া ভেবে পেল না। দুটো বছর অনেক দীর্ঘ সময়।

কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করার উপায় দেখছে না সাদিয়া। বাসর ঘর ওর পছন্দ হয়েছে। একটু এলোমেলো হয়ে আছে, কিন্তু অনেক দামী, সুন্দর আসবাবে ভরা ঘরটা। এ-ই এখন ওর ঘর, ওর ঠিকানা। এ-ই হচ্ছে ওর বর্তমান। আর সবকিছু পেছনে পড়ে রইল। শেরপুরের বাইশ বছরের জীবন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস-কাম-রেসিডেন্স আর কাজী সাহেবের সেই তরুণ শিষ্য যে গুরুর গুণ আর গুরু-কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল—সব স্মৃতি হয়ে রইল।

স্মৃতি আসলে একটা বিলাসিতা, হঠাৎ সাদিয়ার মনে হল। অতীতের স্মৃতিচারণ কিংবা ভবিষ্যতের কল্পনা করে সুখ-দুঃখ পাওয়া যায়, সময় কাটান চলে। কিন্তু ওগুলো জীবন নয়। জীবন হচ্ছে বর্তমান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের অসংখ্য বর্তমান দিয়ে সাজান এ-জীবন। সবই 'আন্ধার আর আলোর' খেলা।

এক কাজ করলে হয় না? সব অতীতকে অস্বীকার করে ওই ঘুমন্ত লোকের নিঃশ্বাসের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ান যায় না? সাদিয়া সভয়ে দেখল, ভালভাবে কিছু ভাবার আগেই ও পা বাড়িয়েছে। পৌঁছে গেছে সোফার কাছে। সত্যিই ও দাঁড়িয়েছে এক প্রশান্ত, ঘুমন্ত মুখের সামনে। তাকিয়ে দেখছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস, মুখের ছোট ছোট পেশীর একটুখানি চাওয়া.

আন্দোলন। কোন পুরুষের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকার কথা সাদিয়া কখনও ভাবতে পারেনি। আজ সবকিছু অন্যরকম লাগছে। সুন্দর একটা ঘরে ও একজন অনাত্মীয় পুরুষের মুখোমুখি। মাত্র তিনদিন আগে ওই লোকের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না ওর।

নেশাগ্রস্তের মত সাদিয়া মাহমুদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছে না। হঠাৎ ওর মনে হল, লোকটি সুন্দর। ওর প্রতি কৃতিজ্ঞতার কারণে এমন মনে হচ্ছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করল সাদিয়া। তারপর বুঝতে পারল, সত্যিই ও সুন্দর। ওই মুখের দিকে বুঝি ও অনন্তকাল তাকিয়ে থাকতে পারে, কখনও ক্লান্তি আসবে না।

ওই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়? নিজের শরীরের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল সাদিয়া। বঙ্গোপসাগরের বালুবেলায় যেমন ফেনিল উচ্ছ্বাস নিয়ে ঢেউ আছড়ে পড়ে, ঠিক তেমন ঊর্মিমুখর হয়ে উঠেছে বুক। দূর থেকে যেন ছুটে আসছে খ্যাপা বাতাস।

'ম্যারেজ অভ্ কনভিনিয়েন্স?' বাজে কথা। বিয়ে মানেই বিয়ে। দুনিয়ার সবাই জানে, ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার এক চমৎকার বাড়ির বন্ধ কামরায় মরহুম জয়েনউদ্দীন কাজীর মেয়ে সাদিয়া কাজীর নিঃশ্বাস মিলিত হয়েছে মাহমুদ খানের নিঃশ্বাসের সঙ্গে। আর মিস সাদিয়া কাজী নয়, ও এখন মিসেস সাদিয়া খান, সংক্ষেপে মিসেস খান। সবাই বিনা প্রতিবাদে, বিনা সমালোচনায় মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা। শেরপুরের বর্বর পেশীওয়ালা মাস্তানরাও আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি। তবে আর সবার অগোচরে নিজেদের শরীর-মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? কেন আর আত্মপ্রতারণা? কি দরকার অভিনয়ের? 'কাছে থেকে দূর রচনা' করে এমন মূল্যবান

মুহূর্তগুলো নষ্ট করার কোন মানে হয়?

সাদিয়া অনুভব করল, ও কাঁপছে। সারা শরীর, এমনকি নিঃশ্বাসও কাঁপছে থরথর করে। মুখটা আরও একটু এগিয়ে নিল ও। এমন সময় চমকে উঠে চোখ মেলল মাহমুদ। সাদিয়া ছিটকে সরে গেল। কয়েক সেকেণ্ড হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকার পর মাহমুদ স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'কি ব্যাপার? শোবেন না?'

সাদিয়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাহমুদ পাশের দিক থেকে ওর কান দেখতে পাচ্ছে। লতিকার নিচের গোল পাথরের দুলসুদ্ধ ওর কানটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত লাগছে।

মাহমুদ উঠে দাঁড়াল। জানালার পর্দা টেনে সরিয়ে দিল। এক ঝাঁক দুষ্টু পাখির মত ঘরের কার্পেটে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল উজ্জ্বল রোদ। দিনের শুরুটা আজ চমৎকার। হয়ত সুন্দর হবে দিনটা, ভাবল সাদিয়া। কিন্তু ঠিক তার পরেই হঠাৎ চীনেমাটির পাত্র ভাঙার ঝন্‌ঝন্ শব্দে চমকে ওঠে ওরা দুজনেই। শোনা যায় রাশেদার তীক্ষ্ণ গলার স্বর।

'ভাঙল কি করে, রূপা?'

'কফি খেতে খেতে ছোট আব্বার কামরার দিকে যাচ্ছিলাম। দরজা বন্ধ আছে, খেয়াল করিনি।'

'খেয়াল করনি! মন থাকে কোথায়?'

রূপা বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'সকালবেলায় খামোকা বকাবকি করছ কেন, মা? আমার কাপ আমি ভেঙেছি। তাতে হয়েছেটা কি?'

রাশেদা বলল, 'হয়েছেটা কি, এখনও বুঝতে পারনি? দিনদিন কচি খুকি হচ্ছ নাকি? ওই কাপের মালিক তুমি একা নও। এ-বাড়ির সব জিনিসের অর্ধেক মালিকানা তোমার "জানের জান ছোট আব্বুর".

এটা বোঝ না?'

'হ্যাঁ, তা-ও বুঝি। কিন্তু ছোট্ট আব্বু তো আর বাইরের কেউ নন!

রাশেদার স্বর আরও তীক্ষ্ণ হল। 'ওসব দিনের কথা ভুলে যাও। এখন ছোট আব্বুর জিনিসে আর একচেটিয়া মালিকানা নেই। নতুন মালিক এসে গেছে। যে-বন্ধ দরজায় হোঁচট খেয়েছ, সেটা চিরদিনের জন্যেই বন্ধ হয়েছে। এখন নিজের পথ দেখ, মা।'

মাহমুদ একটানে দরজা খুলে বলল, 'কি হয়েছে, রূপা?'

রূপা দ্রুত সামনে থেকে সরে যেতে যেতে বলল, 'কিছু না।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সাদিয়া দেখল, ডাইনিং টেবিলে অপেক্ষা করছে মাহমুদ। রূপা আর রাশেদা খেতে শুরু করেছে। অন্তত আজকের মত ওর জন্যে অপেক্ষা করে ভদ্রতা দেখালে কোন ক্ষতি হত না ওদের— ভাবল সাদিয়া।

টেবিলে প্রচুর নাশতা সাজান আছে। সাদিয়া একটা পরাটা তুলে হাত বাড়িয়ে রূপার প্লেটের দিকে এগিয়ে দিল।

রূপা অপ্রসন্ন মুখে বলল, 'আমি পরাটা খাই না।'

সাদিয়া বলল, 'আজ না হয় একটা খাও! আমি দিচ্ছি।'

আড়চোখে তাকিয়ে ছিল রাশেদা। 'রূপা কর্নফ্লেক্স্ খাবে। তুমি খাও। খাওয়ানর জন্যে তোমার আবার লোকের অভাব আছে নাকি, ভাই?'

সাদিয়া শান্ত চোখে রাশেদার দিকে তাকাল। তারপর একটা পরাটা তুলে নিয়ে হাসিমুখে বলল, 'অ্যাই, তোমাকে দেব?'

'দাও।'

মাহমুদ পরাটার কোনা ছিঁড়ে মুখে পুরল। 'একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে

শেরপুর গিয়েছিলাম, জানই তো!' রাশেদার দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিক সুরে বলতে শরু করলো মাহমুদ।

রাশেদা ফ্রাই-করা মুরগির রানগুলো শেষ করে হাত বাড়াল পুডিং-এর বাটির দিকে। মাহমুদের কথাটায় বিশেষ আমল দিল না সে। বলল, 'উদ্দেশ্যটা সাধন করে ফিরেছ, তা তো বুঝতেই পারছি!'

'না, ভাবী, পারছ না। সাদিয়ার সঙ্গে পরিচয় আর বিয়ের ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট। কেউ কখনও অ্যাক্সিডেন্টের উদ্দেশ্যে বাইরে যায় না। আমার উদ্দেশ্যের কথাটা নিশ্চয়ই তোমার মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই!'

'তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমার বিয়ের প্রমাণ খুঁজে আনা। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়েই হয়নি। প্রমাণ কোথায় পাবে?'

'তবু পেয়েছি, ভাবী। ইচ্ছে হলে দেখতে পার।'

রাশেদা একটা আপেলে কামড় বসাল। 'তা-ও জানি। তুমি কখনও হারবে না। বিয়ের প্রমাণ যোগাড় হয়নি বলে তুমি তো আর বসে বসে আঙুল চুষতে পার না! তুমি ঠিকই একটা প্রমাণ তৈরি করে এনেছ!'

চমকে উঠল সাদিয়া। মহিলা বলে কি! দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারে বোধহয়! সাদিয়ার চোখে ভেসে উঠল কয়েকটা আবছা দৃশ্য। তখন ওর বয়স পাঁচ কিংবা ছয়। সন্ত্রস্ত হরিণের মত ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসের দরজায় কড়া নাড়ছিল এক তরুণ আর অল্প বয়সের তরুণী। হয়ত তখন রাশেদার বয়স বিশ কিংবা একুশের বেশি নয়। তরুণটির হাত ধরে পালিয়ে এসেছিল কাজীর অফিসে। ভয়ে কাঁপছিল সে। সাদিয়ার বাবা অনেকক্ষণ কথা বললেন ওদের সঙ্গে। বোঝালেন। নিরস্ত করতে চাইলেন। তারপর যখন দেখলেন.

ওদের সিদ্ধান্ত একটুও নড়চড় হবার নয়, তখন রাজি হলেন বিয়ে পড়াতে। অবশ্য বিয়েটার পেছনে রাশেদার ভাইদেরও হাত ছিল, কাজী সাহেব পরে তা বুঝেছেন।

কয়েকটি কারণে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে দেরি হচ্ছিল। রাশেদা বারবার তাকাচ্ছিল আব্দুল্লাহর দিকে। আব্দুল্লাহ প্রথমে বিয়েতে রাজি ছিল না। কিন্তু রাশেদার ভাইদের ক্রমাগত চাপের মুখে পিছিয়ে আসার উপায় ছিল না ওর।

সেই রাশেদা আজ কিভাবে আব্দুল্লাহর সঙ্গে বিয়ের কথা পুরোপুরি অস্বীকার করছে, সাদিয়া ভেবে পেল না। ও তখন খুবই ছোট। চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নইলে রাশেদা নিজেও চিনতে পারত তার বিয়ের কাজীর মেয়েকে। একটা লাল ফ্রক পরে সাদিয়া ঘুরঘুর করছিল ওদের আশেপাশে। মনে পড়ল, আব্দুল্লাহ ওকে 'লাল মেয়েটি' বলে ডেকেছিল দু-একবার।

সামান্য সম্পত্তি কিংবা পেশার মোহে কেউ নিজের বিয়ের ইতিহাস অস্বীকার করতে পারে? অস্বীকার করতে পারে নিজের সন্তানের জন্মের বৈধতা? অসম্ভব। এখানে অন্য কোন ইতিহাস আছে। ঘটনাটা এখানেই শুরু হয়নি। এর পেছনেও আছে কোন ঘটনা।

কর্নফ্লেক্স্ আর কফি খেয়ে রূপা উঠে পড়ল। দুমদাম করে পা ফেলে চলে গেল নিজের কামরার দিকে।

মাহমুদ কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'প্রমাণ আমি তৈরি করে আনিনি। আব্দুল্লাহর সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হয়েছিল, তার প্রমাণ আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়নি, ভাবী। আছে সে-প্রমাণ। আমি যোগাড় করে এনেছি।'

রাশেদার মুখ হাঁ হয়ে গেল। 'এসবের মানে কি, মাহমুদ?'

মাহমুদ নির্বিকারভাবে বলল, 'মানে খুব সহজ। আব্দুল জব্বার তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। তার তথ্যও ভুল। ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে আগুন লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু সব কাগজপত্র পুড়ে যায়নি। কিছু কিছু উদ্ধার করা গেছে। তোমার ভাগ্য খারাপ, ভাবী, মামলায় তুমি জিততে পারছ না। আব্দুল জব্বারও বেশ বেকায়দায় পড়ল, মনে হচ্ছে।'

'অসম্ভব!' হঠাৎ হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠল রাশেদা। 'কোন চক্রান্তের চেষ্টা কর না, মাহমুদ। ফল ভাল হবে না। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।'

'কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

রাশেদা কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'আব্দুল জব্বারের সঙ্গে। রূপা ওরই মেয়ে।'

মাহমুদ তিক্ত হাসির সঙ্গে বলল, 'তা হলে চক্রান্তটা করেছিলেন মরহুম জয়েনউদ্দীন কাজী! আব্দুল জব্বারের বদলে আব্দুল্লাহ খানের নাম বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাই না?'

রাশেদা বলল, 'তা আমি জানি না। কিছুদিন আগে আব্দুল জব্বার বিয়ের ডকুমেন্ট যোগাড় করার জন্যে শেরপুর গিয়েছিল। কিছুই পাওয়া যায়নি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার সাহেব জানিয়েছিলেন, সব আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ও বিশ্বাস করেনি। থানায় যোগাযোগ করেছে। থানা কর্তৃপক্ষও কনফার্ম করেছে। ওদের রেকর্ডে লেখা আছে, ওই সময়ের আগের সব দলিল নষ্ট হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে একটা গেজেট নোটিফিকেশনও হয়েছে। সে সব কাগজপত্র যোগাড় করেছে জব্বার। সময়মত ওগুলো আদালতে হাজির করা হবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাহমুদ তাকাল রাশেদার দিকে। 'এতেই তুমি প্রমাণ করবে, আব্দুল্লাহর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি! খামোকা কথা বাড়িও না, ভাবী। ঝগড়াটা যখন শেষ পর্যন্ত আদালতেই হবে, তখন বাড়িতে অশান্তি ঘটিয়ে লাভ কি?'

'কথা বাড়াচ্ছ তুমিই। আমি কয়েক বছর তোমার ভাইয়ের সঙ্গে "লিভ টুগেদার" করেছি। রূপার ওপর তোমাদের কোন অধিকার নেই। এখন তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে এত ষড়যন্ত্র শুরু করেছ, কেন এত উতলা হয়েছ রূপাকে ধরে রাখতে, আল্লাই জানে। কিন্তু একটা কথা খুব পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাই, কোন লাভ হবে না তোমার। প্রশ্নটা আমার বিষয় নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে রূপার পিতৃত্ব আর অভিভাবকত্ব নিয়ে। তুমি কেন এত অস্থির হয়ে উঠেছ? আমাদের সমস্যা আমরাই সমাধান করব। তুমি যত এর মধ্যে নাক গলাবে, ততই জটিলতা বাড়বে। কখনও প্রমাণ করতে পারবে না, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।'

হঠাৎ মুখ খুলল সাদিয়া। 'কাগজে-কলমে না হলেও আমি আপনার বিয়ের একজন সাক্ষী। আমি আদালতে সাক্ষ্য দেব।'

রাশেদার হাত থেকে কফি ছলকে পড়ল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি···তুমি কে?'

সাত

দুপুরে ঘুমানর অভ্যেস নেই। কথা বলার মত কাউকে খুঁজে না পেয়ে সাদিয়ার সময় যেন কাটতে চায় না। মাহমুদ যতক্ষণ বাসায় থাকে, ততক্ষণ নিঃসঙ্গতার কষ্ট অনুভব করে না সাদিয়া। কিছুটা অভিনয়, কিছুটা বাস্তব জীবনের মনোভাব বিনিময়, এইসব নিয়ে দিব্যি সময় কেটে যায়। কিন্তু মাহমুদ ব্যস্ত মানুষ। ছোটখাট একটা শিল্প চালাতে হয় ওকে। সেখানে আছে কাঁচা টাকা, কাঁচামাল আর কাঁচা ব্যবস্থাপনার সমস্যা। শ্রমিক অসন্তোষ, পরিবহণ ধর্মঘটের মত সমস্যাও ওকে পীড়িত করে তোলে। বাসায় স্ত্রীকে বেশি সময় দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সাদিয়াও তা চায় না। প্রথম রাতের নিদ্রাহারা মুহূর্তগুলো এখনও ওর কাছে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত মনে হয়। মাহমুদ কাছে এলে ওর শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ জাগে। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে ও আবিষ্কার করে, সব ভুলে মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই নিজেই ওর কাছ থেকে দূরত্ব তৈরি করে নেয় সাদিয়া। নৈকট্যের সুযোগ থাকলেও এড়িয়ে যায় মাহমুদকে।

মাহমুদের বউ মরহুম জয়েনউদ্দীন কাজীর মেয়ে—কথাটা জানার

পর চুপসে গেছে রাশেদা। এমনকি রূপাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। আগে সে যখন-তখন কথার বানে বিদ্ধ করছিল সাদিয়াকে। এ-অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছে ও পিতৃপরিচয় প্রকাশিত হবার পর। কিন্তু এতে সাদিয়ার একটা ক্ষতিও হয়েছে। নিঃসঙ্গতা চরমে উঠেছে। রাশেদা বা রূপা—কেউই ওর ধারে-কাছে ঘেঁষছে না। একসময় মনে হল, মানুষ আসলে না-বুঝেই বলে, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। শূন্যতা কোন কোন সময় ভয়ঙ্কর অসহ্য হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যেমন শূন্যতা সহ্য করে না, তেমনি মানুষও চায় মানুষের সাহচর্য, সংস্রব। তখন মনে হয়, খারাপ মানুষও ফাঁকা বাড়ির চেয়ে ভাল।

একটা বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল সাদিয়া। প্রিয় লেখকদের জমজমাট উপন্যাসও এখন ভাল লাগছে না। কয়েক পাতা উল্টে যাবার পর সাদিয়া আবিষ্কার করে, একটা লাইনও পড়েনি ও। অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলিয়ে গেছে শুধু। বই রেখে পায়চারি করতে শুরু করল সাদিয়া।

লালু এসে দাঁড়াল এক সময়। 'মেমসায়েব, মনডা বালা নাই?'

সাদিয়া নীরবে হাসল। কিছু বলল না। সবার সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় না। দেয়ার দরকারও নেই।

লালু বলল, 'মেমসায়েব, অ্যালবাম দ্যাখবেন?'

চমৎকার প্রস্তাব। অ্যালবামে একটা পরিবারের অনেক কাহিনী সাজান থাকে। অনেক চরিত্র, মুখ আর মুখোশের দেখা মেলে ফটোগুলোর মাধ্যমে। সাদিয়া বলল, 'বেশ, নিয়ে এস।'

লালু ড্রইং রূম থেকে একতাড়া অ্যালবাম নিয়ে এল। পাতায় পাতায় অফুরন্ত ছবি। সাদা-কালো, রঙিন। নতুন আর পুরনো।

সাদিয়া ফটোগুলোর ভিতরে হারিয়ে গেল। আব্দুল্লাহর ফটো দেখেই ওদের বিয়ের সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হল ও। লোকটিকে চিনতে পেরেছে। মানুষের মনের ভিতর অনেক পুরনো স্মৃতি থাকে, যা ফটোগ্রাফের চেয়েও উজ্জ্বল।

বেশিরভাগ ফটো অবশ্য রূপার। নানান জায়গায়, অসংখ্য ভঙ্গিতে রূপার ফটো তোলা হয়েছে। মাহমুদের ফটো খুঁজে পেল না সাদিয়া। বোঝা যায়, প্রায় সব ছবিই তুলেছে মাহমুদ। সাদিয়ার বিয়ের কোন ফটো তোলা হয়নি। হঠাৎ হেসে ফেলল ও। এটা কি আসলে বিয়ে? হতেই পারে না। কাজীর সামনে কলেমা পড়ে, একটা চুক্তিপত্রে সই করা কখনই বিয়ে নয়। বিয়ে একেবারেই অন্য জিনিস। চুক্তি করে ব্যবসা হয়, টাকা লেনদেন কিংবা জমি কেনাবেচা হতে পারে, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। বিয়ে মানে দুজন নর-নারীর ভালোবাসার সবচেয়ে স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। বিয়ে মানে দুজন নর-নারীর চূড়ান্ত মিলন। ওটা চুক্তি ছাড়াই হতে পারে। আকাশের পাখি যেমন দেশ-মহাদেশের সীমানা মানে না, ভালোবাসারও তেমনি কোন গণ্ডি নেই। কাগজের ফরমে কালি-কলমের আঁচড়ে হয়ত আইনের চাহিদা পূরণ হয়, কিন্তু মানুষের মনের চাহিদা অনেক বেশি। সে-চাহিদা মেটানর ক্ষমতা শুধু মানুষের। বিয়ের পদ্ধতির ওপর সাদিয়ার অশ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে।

চিলের মত তীক্ষ্ণ স্বরে রাশেদা চিৎকার করে উঠল, 'লালু! অ্যাই লালু! কোথায় তুই?'

লালু ছুটতে ছুটতে রাশেদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'জ্বে, বেগম সায়েব। আমি তো রান্নাঘরে কাম করতাছি!'

'কানে শুনতে পাস না? আধঘন্টা ধরে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছি!'

সাদিয়া ফটোর অ্যালবামগুলো গুছিয়ে হাতে তুলে নিল। রাশেদা না চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না। সব কথাই ওর কানে যাচ্ছে। তার হাঁকডাকের মুখে বিষম বিপন্ন বোধ করছে বেচারা লালু। সাদিয়া জানে, রাশেদা মোটেই আধঘন্টা ধরে গলা ফাটাচ্ছে না। তার প্রথম ডাকেই লালু সাড়া দিয়েছে।

'অ্যাই, হতচ্ছাড়া, অ্যালবামগুলো কোথায়?'

সাদিয়া রুদ্ধশ্বাসে অ্যালবামগুলো দু'হাতে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ও কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই লালুর গালে রাশেদার পাঁচটা আঙুলের দাগ বসেছে প্রচণ্ড শব্দে। কাঁদতে ভুলে গিয়ে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে লালু।

'ভাবী,' হতভম্ব হয়ে সাদিয়া বলল, 'ফটোগুলো আমি নিয়েছিলাম দেখার জন্যে। এই নিন।'

চোখ-মুখ কুঁচকে রাশেদা বলল, 'ফটোগুলো ধুয়ে পানি খাওয়ার দরকার নেই আমার। আমি শুধু ওই বেয়াদব ছোকরাকে শিক্ষা দিতে চাই। কত সাহস! আমার অনুমতি ছাড়াই অ্যালবামে হাত দিয়েছে!'

সাদিয়া বলল, 'ওর কোন দোষ নেই। আমিই চেয়েছিলাম ওগুলো।'

ঝাঁজের সঙ্গে রাশেদা বলল, 'তুমি আর ওর মাথাটা খেও না। এমনিতেই মাহমুদের প্রশ্রয় পেয়ে ওর বেয়াদবির সীমা নেই।'

সাদিয়ার মেজাজ ঠিক রাখা দায় হল। 'ওর বেয়াদবি আমার চোখে পড়েনি, ভাবী। আমি শুধু আপনার আদব-কায়দা দেখছি। এবার দয়া করে আমাকে বলে দিন, এ-বাড়ির কোন জিনিস নিতে হলে কার অনুমতির দরকার হয়। একটা তালিকা করে দিলে আমার

সুবিধে হবে।'

স্তম্ভিত হয়ে রাশেদা সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। বাপের বাড়িতে চিরকাল সে 'বদমেজাজী' হিসেবে বিশেষ খাতির পেয়েছে। বিয়ের পর আব্দুল্লাহ সব সময় ওর মেজাজ বুঝে চলেছে। কাজের লোকেরাও ওর ভয়ে সদা তটস্থ। ওর মুখের ওপর কথা বলার সাহস ক'জনার? আব্দুল্লাহর সঙ্গে বিয়ের কথাটা অস্বীকার করার পরও এ-বাড়িতে ওর দাপট কমেনি। এমনকি মাহমুদও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সাদিয়া জানে, মেজাজী লোককে ঠাণ্ডা রাখার একমাত্র উপায় পাল্টা মেজাজ দেখান। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি এই যে আমাদের সমাজে দুর্মুখ, দুর্ধর্ষ ধরনের লোকেরাই খাতির আর মর্যাদা পেয়ে থাকে। মিষ্টভাষী, কোমল স্বভাবের নেতা কোথাও নেই। কেউ বিনম্র, শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না।

'তুমি···এসব···কি বলছ?' ধীরে ধীরে বলল রাশেদা, 'তোমার গায়ে এখনও মেহেদির গন্ধ লেগে আছে। অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে, পাকা গিন্নি হয়ে এ-বাড়ির সবকিছু দখল করে নিতে চাও!'

তিক্ত স্বরে সাদিয়া বলল, 'আপনি তো শুনলাম এ-বাড়ির কেউ নন। তা হলে তো এ-বাড়ির জিনিসপত্রের দখল নিয়েও আপনার মাথাব্যথা হবার কথা নয়! আপনার নিজের বাড়ির অবস্থা কি? সেখানকার জিনিসপত্র কার দখলে আছে, ভাবছেন?'

রাশেদা চিৎকার করে উঠল। 'তোমাকে···আমি···আমি সাবধান করে দিচ্ছি।'

রূপা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটা ফ্যাশান ম্যাগাজিন দেখা যাচ্ছে ওর হাতে। 'মা, থাম তো!'

'রূপা, তোকে আগেই বলেছি, এ-বাড়িতে আর থাকা চলে না!'

সাদিয়া বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত। অন্যের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে নেই। সম্পর্ক বেশি তিক্ত হবার আগে সরে পড়াই ভাল।'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রাশেদা বলল, 'বেশি বাড়াবাড়ি কর না। এখনও আমি আমার সম্পদ-সম্পত্তির ভাগ বুঝে পাইনি।'

'আপনার আচরণ দেখে সে-কথা বোঝার উপায় নেই, ভাবী। যার সঙ্গে আপনার বিয়েই হয়নি, তার সম্পত্তির ভাগই নয়, মনে হচ্ছে, এখানকার সবাই আপনার একচেটিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এমনকি কাজের মানুষরাও।'

'মুখ সামলে কথা বল।'

রূপা এসে ওর মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরল। 'ঘরে চল, মা। এখন ঝগড়া করার সময় নয়। ছোট আব্বা রাগ করবেন।'

সাদিয়ার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মা-মেয়ে সাদিয়ার সামনে থেকে চলে গেল। লালুর হাতে অ্যালবামগুলো দিয়ে সাদিয়া বলল, 'এগুলো ড্রইং রুমে রেখে আমার কামরায় এসো।'

অডিকোলনের বোতল বার করল সাদিয়া। টিস্যু পেপার অডিকোলনে ভিজিয়ে চেপে ধরল ছেলেটির মুখে।

'জ্বালা করছে?'

'জ্বে, মেমসায়েব।'

'এখনই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

কৃতজ্ঞতায় লালুর মাথা নিচু হল। সাদিয়া বলল, 'রূপার মা কি এই প্রথম এমন আচরণ করল?'

'জ্বে না, মেমসায়েব। প্রায়ই এমুন কইর‍্যা আমারে পিটায়।'

'তুমি তোমার ছোট স্যারকে জানাও না?'

লালু কেঁদে ফেলল। 'একদিন কইছিলাম। শুইন্যা বেগম সায়েব মাইর‍্যা আমারে অজ্ঞান কইর‍্যা ফেলছিল। হেরপর থেইক্যা আর কুনোদিন কইনাই। ভয় লাগে, মেমসায়েব।'

'এখন থেকে আর তোমার ভয় নেই। সব অসুবিধের কথা আমাকে জানাবে। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।'

খুশি হয়ে চোখ মুছল লালু। 'আইচ্ছা, মেমসায়েব। চা খাইবেন?'

সাদিয়া অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। লালু চলে গেছে। তবু অডিকোলনের বোতল আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও। মাহমুদ ফিরে এসে যখন এসব শুনবে, তখন কেমন দাঁড়াবে ব্যাপারটা, কল্পনা করতে চেষ্টা করছে।

রূপা ফিরে এসে একটু দূরে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ড লক্ষ করল ওকে। তারপর বলল, 'শুনুন—'

সাদিয়া চমকে তাকাল।

'মা'র সঙ্গে অমনভাবে কথা বলাটা আপনার ঠিক হয়নি। আপনি নতুন এসেছেন। আপনার উচিত ছিল ধৈর্য ধরা।'

সাদিয়া শান্ত গলায় বলল, 'আমাকে উপদেশ দেবার বয়স তোমার এখনও হয়নি, রূপা। তুমি যদি নিজের ভাল বুঝতে চাও…'

রূপা ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'আপনার উপদেশও শুনতে চাই না আমি। আমি নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছি। আপনি নিজের চরকায় তেল দিন।'

সাদিয়া হেসে ফেলল। 'তুমি এ-বাড়ির মেয়ে। তোমার মা যতই অস্বীকার করুক, বংশের ধারা অস্বীকার করবে কিভাবে? তাই তোমার ভাল-মন্দ আমার চরকারই অংশ। ওটা আমাকেই দেখতে হবে।'

বিশ্রী একটা মুখভঙ্গি করে চলে গেল রূপা।

বিকেলে বাড়ির পেছন দিকের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সাদিয়া। একটু আগে মাহমুদ টেলিফোন করেছে ফ্যাক্টরির অফিস থেকে।

'চা খেয়েছেন?'

'না, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

মাহমুদ বলেছে, 'আমার একটু দেরি হবে। আপনি বরং···'

'উঁহুঁ। আপনি আসুন। একসঙ্গে চা খাব। একা চা খেতে আমার ভাল লাগে না।'

'একা!' মাহমুদকে চিন্তিত মনে হল। 'ভাবী কিংবা রূপা—কেউ কি আপনাকে সঙ্গ দিচ্ছে না?'

সাদিয়া বলেছে, 'ওদের সঙ্গলাভের চেয়ে নিঃসঙ্গতাই ভাল।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকেছে মাহমুদ। তারপর বলেছে, 'বেশ, অপেক্ষা করুন। আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি।'

সাদিয়া পেছন দিকের বাগানে পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গেল কোণার দিকে। ঠিক সামনেই রাশেদার ঘর। জানালাটা খোলা। ভারী পর্দা ঝুলছে। রূপা বা ওর মা—কারও ঘরে ঢোকেনি সাদিয়া। তবু ওর অনুমানঃ ঘরগুলো অত্যন্ত অগোছাল আর অপরিষ্কার। সুন্দর মনের মানুষেরা অপরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না। আবার যারা পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, সুন্দর জীবন যাপন করে, তাদের মন কখনও অপবিত্র হয় না।

মাহমুদ বেশ যত্ন নেয় ফুলগাছ গুলোর। প্রত্যেক পাতায়, ডালে সে-যত্নের প্রমাণ পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক পরিশ্রমের ক্ষমতা এই লোকের। সাদিয়া ভেবে পায় না, এমন চমৎকার মানুষটি ভিতরে ভিতরে এত নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব কেন? নাকি, সাদিয়ার মতই ওর জীবনে ঘটে গেছে অনুরূপ কোন নাটক? লোকটা তারই রেশ টেনে বেড়াচ্ছে?

বাইরের গেটে গাড়ির হর্ন বাজল। শব্দটা অপরিচিত। মাহমুদের হোণ্ডা সিভিক গাড়ির নয়। সাদিয়া ভেবেছিল, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। দেখবে, কে এল। কিন্তু গাছগুলো যেন ওকে যাদু করেছে। কিছুতেই সরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

অবশ্য মিনিটখানেকের মধ্যেই সাদিয়া বুঝল, আগন্তুক আব্দুল জব্বার। রাশেদার ঘরের ভিতর থেকে লোকটার বাজখাঁই গলার শব্দ ভেসে এল।

'কি খবর, মিস বাংলাদেশ?'

রাশেদা বলল, 'ঠাট্টা কর না, জবু। তোমার ঠাট্টা শোনার মত মানসিক অবস্থা নেই আমার।'

'বল কি! বল কি!' হৈ হৈ করে উঠল আব্দুল জব্বার, 'তোমার মানসিক অবস্থা খারাপ করার সাহস কার?'

গলার স্বর নিচু করে রাশেদা বলল, 'আর বল না। মাহমুদ ফিরে এসেছে। সব প্রমাণ নাকি হাতে পেয়েছে।'

মেঝের ওপর সশব্দে জুতো ঠুকলো জব্বার। 'মাহমুদ! ফিরে এসেছে! কবে···কবে এসেছে?'

'গত পরশু রাতে।'

জব্বারের গলায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। 'গত পরশু রাতে! তুমি আমাকে খবর দাওনি কেন, ডার্লিং?'

'চেষ্টার কি ক্রটি রেখেছি? তোমার টেলিফোনে কি এক ঘোড়াডিম টেপ বসিয়ে রেখেছ! একটানা বলতে থাকে, "আব্দুল জব্বার সাহেব এখন নেই। আপনার খবর থাকলে বলুন। উনি ফিরে আসার পর জেনে যাবেন।" এইসব।'

হো হো করে হেসে উঠল আব্দুল জব্বার। বিশ্রী, ভিলেন ঢঙের

হাসি। এসব হাসি সিনেমার চরিত্রাভিনেতাদের গলায়ই মানায়।

'কি করব, বল। মানুষ তো আমি একা! কিন্তু অবস্থা দশাননের মতই। রাক্ষসরাজ রাবণের চেয়েও আমার দায়িত্ব আর ঝামেলা বেশি।'

রাশেদা মধুর সুরে বলল, 'তা তো ঠিকই, জবু। কখনও ব্যবসায়ী, কখনও চিত্রনির্মাতা, আবার কখনও তুমি অভিনেতা।'

'শুধু কি তাই? এরপর আছে সমাজ সেবক, রাজনীতিবিদ আর পত্রিকা সম্পাদকের কাজ। আমি একজন শিল্পপতি। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথ আর জ্যোতিষী হিসেবেও তো নাম করেছি!'

রাশেদা ফিসফিস করে বলল, 'দশ নম্বরটা পুরিয়ে দিই, কি বল? তুমি একটা প্রথম শ্রেণীর লম্পট।'

আব্দুল জব্বার গম্ভীর হয়ে বলল; 'কাজের কথায় ফিরে এস, রাশেদা।'

রাশেদার স্বর তীক্ষ্ণ শোনাল। 'তুমি নিজে ডুববে, জবু, আমাকেও ডোবাবে। তুমি না শেরপুর থেকে পাকা খবর নিয়ে এসে আমাকে বললে, বিয়ের ডকুমেন্টগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ। এ-ব্যাপারে গেজেট নোটিফিকেশন পর্যন্ত...'

ধমকের সুরে রাশেদা বলল, 'রাখ তোমার গেজেট নোটিফিকেশন! মাহমুদ বলছে, ও সব প্রমাণপত্র যোগাড় করে এনেছে।'

জব্বার হেসে ফেলল। 'ঠাট্টা করেছে মাহমুদ খান।'

'একটুও না। ও ঠাট্টা করে না। মিছে কথাও বলে না। ওকে আমি চিনি।'

জব্বার চিন্তিত হয়ে পড়ে। 'সত্যি বলছ? ভাবিয়ে তুললে দেখছি।

তা তোমার দেবর রত্ন কোত্থেকে যোগাড় করল ওসব প্রমাণ?'

'জয়েনউদ্দীন কাজী আব্দুল্লাহর সঙ্গে আমার বিয়ে পড়িয়েছিলেন।'

জব্বার তাড়াতাড়ি বলল, 'একটা সুখবর আছে, ডার্লিং। উনি আর বেঁচে নেই। দেড় মাস আগে মারা গেছেন। মাহমুদ যতই বলুক...'

রাশেদা বাধা দিয়ে বলল, 'থাম। আমার কাছে যে-সুখবর আছে, তা আরও মজাদার। উনি বেঁচে থাকলে হয়ত মাহমুদ প্রমাণ যোগাড় করতে পারত না। জয়েনউদ্দীন কাজী মরেছেন, আমাদেরও মেরে গিয়েছেন।'

'মানে!'

'আমার সুদর্শন দেবর অতি সহজে লাইন করে ফেলেছে তাঁর মেয়ের সঙ্গে। দু'জনে মিলে খুঁজে বার করেছে আধপোড়া ডকুমেন্ট—যা কাজী সাহেব ট্রাঙ্কে পুরে বক্স-এ তুলে রেখেছিলেন।'

জব্বার বলল, 'আরে দূর! চিন্তা কর না। ওসব ছাইপাঁশ আদালতে দাখিল করে কোন কাজ হবে না। জজ সাহেব গুরুত্ব দেবেন গেজেট নোটিফিকেশনের ওপর। সবচেয়ে বড় কথা, কোন সাক্ষী নেই।'

'সেখানেও মস্ত ভুল হয়েছে তোমার। সাক্ষী আছে।'

কাঁপা কাঁপা গলায় আব্দুল জব্বার বলল, 'কে?'

'কাজী সাহেবের মেয়ে। সাদিয়া।'

'শেরপুর থেকে ওই সাক্ষীকে ঢাকায় নিয়ে আসার আগেই আমরা কাজ সেরে ফেলব। আব্দুল জব্বার কাঁচা কাজ করে না।'

রাশেদা বলল, 'আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল, জবু, কিন্তু তুমি মাঝে মাঝে সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি করে ফেল। মাহমুদের কাজও পাকা। সে সাদিয়াকে সঙ্গে করে এনেছে। একেবারে কলেমা পড়ে, বউ করে

ঘরে তুলেছে তাকে। আব্দুল্লাহর সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়, তখন ওই মেয়ে ছয় বছরের বাচ্চা। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। আজ দেখলাম, অ্যালবাম ঘেঁটে আব্দুল্লাহর ফটোগুলো আলাদা করে গবেষণা করছে। ওই মেয়েও খুব ডেঞ্জারাস। নিজেদের বেশি চালাক আর নিরাপদ মনে করার কোন কারণ নেই, জবু মিয়া।'

অনেকক্ষণ সাড়া নেই কারও।

রাশেদা বলল, 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি···সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হবার পথে।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রাশেদা। 'ভণ্ডুল হবে কেন?'

'আদালত যে-দুটো শর্ত দিয়েছিল, সেগুলো তবে পালন করতে পারবে তোমার দেবর। তার মানে···রূপার আশা আমাদের বাদ দিতে হচ্ছে। কিন্তু রূপাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি। আগের ছবিটা ফ্লপ্ করার ফলে কোন অভিনেত্রীই আমার সঙ্গে কন্ট্রাক্টে আসতে চাইছে না। ভেবেছিলাম রূপাকে নামিয়ে দেব নায়িকার রোলে। ···কিন্তু···সব গুড়ে বালি। মাহমুদ খান মামলায় জিতে যাবে। রূপাকে আটকে রাখবে সে।'

রাশেদা বলল, 'রূপা আর আগের রূপাটি নেই। হঠাৎ বদলে গেছে আমার মেয়েটা। মাহমুদ হঠাৎ বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরেছে—ব্যাপারটা ওর একটুও পছন্দ হয়নি। আমার চেয়েও ওই মেয়ে চালাক।'

আব্দুল জব্বার হাসল। 'তা মানছি। কিন্তু ঝুঁকি তো থেকেই যাচ্ছে!'

রাশেদা খুব নিচু গলায় বলল, 'সে-ক্ষেত্রে পথ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে। এত সহজে হার মানা আমার পোষাবে না, বাপু।'

'তার মানে?'

'মানেটা এখন ব্যাখ্যা করতে পারছি না, লক্ষ্মীটি। মাফ কর। কয়েক দিন সময় চাই। ফোন করব তোমাকে। তখন চলে এস। আলাপ করা যাবে। রাগ করলে না তো?'

'না, না। রাগ করব কেন, ডার্লিং? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। আমি নিশ্চিন্ত।'

আবেগঘন গলায় আব্দুল্লাহ খানের বিধবা স্ত্রী বলল, 'অ্যাই, সত্যি বলছ? ছেলে ভুলান কথা নয় তো?'

আরও আবেগময়, কাঁপা কাঁপা স্বরে জব্বার বলল, 'ওগো, না।'

বাগানে চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ের আড়ালে সাদিয়ার গায়ে কাঁটা দিল যেন। আব্দুল জব্বার আর রাশেদা—দু'জনেই বেশ উঁচু স্বরে কথা বলে। সবই শুনতে পেয়েছে সাদিয়া। শুধু ওরা ফিসফিস করে যেসব কথা বলেছে, সেগুলো বুঝতে পারেনি।

আর কিছু বোঝার দরকার নেই। দ্রুত সরে এল সাদিয়া।

বাড়ির সামনের পর্চে এসে ও দেখল, রূপা একটা লাল টয়োটা স্টারলেটের ড্রাইভিং সীটে বসে গাড়ি চালান শিখছে। পার্কওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। তারপর আবার ঘুরে আসছে পর্চের কাছে। বোঝা যায়, গাড়িটা আব্দুল জব্বারের।

সাদিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে রূপা গাড়িটা থামাল। সাদিয়ার দিকে ফিরে না তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল সীটে। কি যেন ভাবছে সে।

সাদিয়া ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। দাঁড়াল ড্রাইভিং সীটের জানালার পাশে। হঠাৎ ওর মায়া লাগল কিশোরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে। রূপার দেহসৌষ্ঠব আর কমনীয়তার তুলনা হয়

না। এক কথায় ও অপরূপা। অপূর্ব এক পবিত্রতা ফুটে আছে ওর চোখ-মুখে।

'রূপা—'

ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকল সাদিয়া।

রূপা কিছু বলল না।

সাদিয়া আবার বলল, 'আমাকে তুমি একটুও পছন্দ কর না?'

রূপা যেন কথাটা শুনতে পায়নি, এমন ভঙ্গিতে রাস্তার চলমান গাড়িগুলো দেখতে লাগল।

'তোমার ছোট আব্বা আমাকে বিয়ে করেছেন শুধু তোমার কথা ভেবে। অন্য কোন কারণে নয়। তুমি বিশ্বাস কর, রূপা?'

রূপা বলল, 'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি যায় আসে?'

'অনেক কিছু। যে উদ্দেশ্যে আমাদের বিয়ে, তা যদি পূরণ না হল, তবে বিয়েটাই তো বৃথা!'

রূপা অদ্ভুত দৃষ্টিতে সাদিয়ার দিকে তাকাল। 'আমাকে কি করতে হবে?'

'আমার প্রতি সদয় হতে হবে। ভালবাসতে শিখতে হবে।'

রূপা বলল, 'জোর করে ভালবাসা যায় না।'

সাদিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মানি। তবু চেষ্টা করে দেখতে অনুরোধ করছি। তুমি কি ছোট আব্বার কাছে থাকতে চাও? না মা'র সঙ্গে চলে যাবে?'

রূপা এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না। ওকে দেখেই বোঝা যায়, বিষম দ্বন্দ্বে ভুগছে। ওর কি অন্য কোন কষ্ট আছে? কি ভাবছে ও? সাদিয়া ভেবে পেল না। মানুষের মনের খবর যদি অন্যে জানতে পারত!

রূপার মাথায় হাত বুলিয়ে সাদিয়া বলল, 'জীবন যেভাবে আসে, সেভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হয়। তাতে সমস্যা কমে যায়।'

রূপা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার সমস্যা আপনিই বাড়িয়ে তুলেছেন।'

'আমি!'

রূপা হঠাৎ গিয়ার বদল করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। ক্লাচ ছেড়ে গাড়ি ছোটাল সামনের দিকে। সাদিয়া তাকিয়ে রইল। ওর চোখ জ্বালা করছে। মেয়েটা মায়ের রূপ পেয়েছে। সেই সঙ্গে পেয়েছে তার বদমেজাজ।

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মাহমুদ আসছে না। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। সাদিয়া বাড়ির ভিতরে চলে এল। চুপচাপ নিজেদের কামরায় ঢুকে বসে রইল ইজি চেয়ারে। বিষম খারাপ লাগছে ওর। অর্থহীন মনে হচ্ছে জীবনটাকে। মনে হচ্ছে, মাহমুদের "ম্যারেজ অভ্ কনভিনিয়েন্স"–এর প্রস্তাবে রাজি হয়ে ও মস্ত ভুল করেছে। হঠাৎ সেই কিশোর কবির কথা মনে পড়ল। আরও বিষণ্ণতায় মুষড়ে পড়ল সাদিয়া।

লালু বাইরে গেছে। এক কাপ চা হলে বেশ হত। রাঁধুনি কানে কম শোনে। রাশেদা কিংবা রূপার মত চেঁচিয়ে ওদের ডাকতে ইচ্ছে হয় না সাদিয়ার। ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে ও রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কাপ ধুচ্ছিল নিসারের মা।

'এক কাপ চা দিতে পারবে, নিসারের মা?'

রাঁধুনি মহা বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'দ্যাখতাছেন না, কাম করতাছি! অহন বড় বেগম সায়েবের ঘরে চা–নাশতা দিতে অইব। উনার ইস্পেশাল মেহমান আইছে। খুবই বালা মানুষ। আইলেই আমারে দশ–বিশ টেহা বখশিশ দেয়। আপনার চা দিতে দেরি অইব।'

সমঝোতার সুরে সাদিয়া বলল, 'ঠিক আছে, স্পেশাল মেহমানকে চা দাও। তারপর আমাকেও এক কাপ দিও। মাথা ধরেছে।'

ট্রে-তে চা-নাশতা সাজিয়ে রাশেদার ঘরের উদ্দেশে ছুটল নিসারের মা। দরজা পেরোবার সময় কাঁধ ঘুরিয়ে বলল, 'বেশি তাড়া থাকলে নিজেই বানাইয়া লন না! আমার অহন এক্কেরে টাইম নাই।'

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সাদিয়া। ওর মুখ লাল হয়ে গেছে। রাশেদা কি এ-বাড়ির লোকগুলোকে যাদু করেছে? সবাই মিলে কার ইঙ্গিতে এমনভাবে অশোভন আচরণ করছে সাদিয়ার সঙ্গে? কি দোষ ওর?

কতক্ষণ শক্ত পাথরের মত রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, জানে না সাদিয়া। বাইরে মোটরের হর্ন বাজল। মাহমুদ ফিরেছে। তবু ও নড়তে পারল না। যেন চলার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে।

'সাদিয়া—সাদিয়া—কোথায় তুমি?'

ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল মাহমুদ। 'ওখানে কি করছ তুমি?'

সাদিয়া যেন সংবিৎ ফিরে পেল। 'ইয়ে···এক কাপ চা বানাব।'

ঝাঁজের সঙ্গে মাহমুদ বলল, 'কেন, নিসারের মা কোথায়?'

'ভাবীর একজন বিশেষ অতিথি এসেছেন। নিসারের মা খুব ব্যস্ত।'

'আর লালু—?'

সাদিয়া বলল, 'বাইরে গেছে।'

এক সেকেণ্ড ভাবল মাহমুদ। 'তুমি চলে এস, সাদিয়া। আমিও চা খাব। খিদে লেগেছে। নাশতাও চাই। নিসারের মাকে ডাকছি।'

সাদিয়া নিজের কামরায় ফিরে খাটের ওপর বসল। দু-কনুই উরুর উপর রেখে করতলে মুখ ঢাকল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মাহমুদ। নিচু স্বরে বলল, 'বুঝতে পারছি, আপনার ওপর মানসিক নির্যাতন চলছে।'

সাদিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'উঁহুঁ, ওসব কিছুই নয়।'

'ক্ষমা করে দিন আমাকে,' গাঢ় স্বরে মাহমুদ বলল, 'আর কয়েকটা দিন সময় চাই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি জানি।'

রাতে খাওয়ার টেবিলে মাহমুদ রাশেদার মুখোমুখি বসে বলল, 'তুমি কবে আলাদা হচ্ছ? আমি বেশিদিন অপ্রয়োজনীয় অতিথি ঘরে রাখতে চাই না।'

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল রাশেদার ঠোঁটে। 'বেশ তো, ভাই। শিগগিরই চলে যাব। রূপাকেও নিয়ে যাব।'

রাশেদা তীক্ষ্ণ চোখে মাহমুদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। সাদিয়াও ভাবল, ও এখনই প্রতিবাদ করবে। কিন্তু মাহমুদ নির্বিকার মুখে বলল, 'যাও। মামলার দিন তো সামনেই! যদি আদালত আমার পক্ষে রায় দেয়, রূপাকে নিয়ে আসব।'

'বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রাশেদা। তারপর তোতলাতে শুরু করল। 'আ···আর আমার···জিনিসপত্র···সম্পত্তি···!'

'তোমার পাওনা কানাকড়িটিও বুঝে পাবে। তাছাড়া কোর্ট তো আছেই! আমি যদি ঝামেলা করি, তুমি মামলা করতে পারবে। কালকের মধ্যেই রওনা হবার ব্যবস্থা কর।'

'ইয়ে···বেশ···' আমতা আমতা করতে লাগল রাশেদা।

এমন সময় সবাইকে চমকে রূপা বলল, 'আমি যাচ্ছি না।'

রাশেদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তা হলে আমিই বা কিভাবে যাব? আদালতের রায় না হওয়া পর্যন্ত আমাকেও থাকতে হবে এখানে।'

আট

বিষম দুর্বলতা, বমি-বমি ভাব আর শরীরে বেদনা নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সাদিয়া। পাশের ঘরের দরজাটা খোলা। বিছানা পরিপাটি করে চলে গেছে মাহমুদ। এ-ঘরের দরজা খোলা হয় সকাল সাতটার পর। তার আগেই বিছানা গোছানর কাজ সেরে মাহমুদ বেরিয়ে পড়ে। সাদিয়া প্রথমে ভেবেছিল, দাম্পত্যের অভিনয় এভাবে চালান যায় না। শিগগিরই ধরা পড়তে হবে। কাউকেই বোকা ভাবা ঠিক নয়। ওর বাবা মাঝে মাঝে হেয়ারের কথাটার উদ্ধৃতি দিতেন। "সবসময় নিজেকে চালাক আর নিরাপদ ভাবা নিরেট বোকার কাজ"। কাজের লোকেরা হয়ত আঁচ করতে পারবে ব্যাপারটা। তারপর দাবানলের মত সেটা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

কিন্তু কিছুই হয়নি। বাইরের দরজা লক করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সাদিয়া আর মাহমুদ। দু-চারটে জরুরী কথাবার্তা সেরেছে। হাসাহাসি, এমনকি মান-অভিমানও হয়েছে। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে পাশের ছোট ঘরটায় বিছানা পেতে নিয়েছে মাহমুদ। এভাবেই দিনের পর দিন গড়িয়ে গেছে। কাল সন্ধেবেলায় ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছে সাদিয়া। দেড় মাস পেরিয়ে

গেছে। এই আশ্চর্য, অস্বাভাবিক জীবনে কোন ছন্দপতন ঘটেনি। রূপার ভ্রূকুটি, রাশেদার অপমান আর কাজের লোকেদের অবাধ্যতা—সব সহ্য হয়ে গেছে। সত্যিই, সময়ের চেয়ে বড় ওষুধ আর নেই। সব বেদনারই উপশম ঘটাতে জানে ওই মহৌষধ। সাদিয়া আবার চোখ বুজল।

লালু এসে দেখল, মেমসায়েব শুয়ে আছেন। মেমসায়েব কখনও ঘুম থেকে উঠতে এত দেরি করেন না। ধীরে ধীরে ডাকল লালু, 'মেমসায়েব, ও মেমসায়েব!'

সাদিয়া চোখ মেলল। মাহমুদ ছাড়া এ-বাড়িতে আর মাত্র একজন ওর ওপর সদয়। সে এই কিশোর। তথাকথিত শিক্ষিত কিংবা উঁচু বংশের ছেলে নয় সে। তবু ওর হৃদয়ের ঐশ্বর্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশি।

'মেমসায়েব, আপনার শইলডা খারাপ?'

সাদিয়া উত্তর দিতে পারল না। ওর চোখ ছলছল করছে। চা-বিস্কুটের ট্রে পাশের টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে লালু হাঁটু গেড়ে বসল।

'আপনার জ্বর হইছে, মেমসায়েব?'

সাদিয়ার কপালে ঠাণ্ডা হাত রাখল লালু। বেশ আরাম পেয়ে সাদিয়া বুঝতে পারল, শরীরে বেশ তাপ উঠেছে।

চায়ের কাপ টেনে নিয়ে চুমুক দিল সাদিয়া। শরীর কাঁপিয়ে আবার বমি আসছে। টলতে টলতে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ও।

লালু চেঁচিয়ে উঠল, 'বড় বেগম সায়েব! দেইখ্যা যান!'

ডাইনিং রুমে রূপা আর রাশেদা নাশতা করতে বসেছে। টোস্ট আর ওমলেটের মস্ত বড় গ্রাস মুখে পুরে অস্ফুট স্বরে রাশেদা বলল,

'ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?'

'নতুন মেমসায়েব বমি করতাছে।'

রূপা দ্রুত পায়ে ছুটে এল। রাশেদা আরও এক টুকরো ওমলেট মুখে পুরে বলল, 'তা···ভালই তো! আমাদের মাহমুদ কাজের ছেলে! বিয়ে করে বউ ঘরে তুলতে না তুলতেই বাপ হতে যাচ্ছে।'

রূপা বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় কি করা দরকার, ও জানে না।

রাশেদাও ধীর পায়ে রূপার পাশে এসে দাঁড়াল। রূপা ওর মায়ের দিকে তাকাল। কথাগুলোর মানে যেন ঠিকমত বুঝতে পারছে না।

রাশেদা মুখ বিকৃত করে বলল, 'এবার হল তো?'

'মানে!'

'এই সহজ কথার মানে বোঝার মত বয়স তোমার হয়েছে, রূপা। তোমার "ছোট আব্বার" ঘর আলো করে বাচ্চা আসছে। তোমার কপাল পুড়ল। এবার সময় থাকতে থাকতে পথ দেখ।'

ক্লান্ত শরীরে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল সাদিয়া। মানুষ তার নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির ওপর এতো বেশি নির্ভর করে যে অন্য দৃষ্টিকোণের কথা একটুও ভাবতে চায় না। কোথায় যেন একটা কথা পড়েছিল। "মানুষের দৃষ্টিক্ষমতার ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। তার চোখের সামনে আপন মুঠি দূরের পাহাড়টা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে।"

এমনকি মাহমুদের ব্যক্তিগত চিকিৎসকও খবরটা শুনে হেসে ফেললেন। মাহমুদ অফিসে পৌঁছেই মেসেজটা পেয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করেছে ডাক্তার মাসুদকে।

ডাক্তার মাসুদ বললেন, 'আমার তো মনে হয় আপনাকে আর একটা অভিনন্দন জানানর সময় হয়েছে।'

'কি বলছেন, ডক্টর!' বিরক্তি চেপে মাহমুদ বলল।

'কেন, ভাই? ওঁর প্রেগন্যান্সির সম্ভাবনা কি একেবারেই অবাস্তব?'

মাহমুদ এ-প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে বলল, 'আপনি এখুনি আমার বাসায় চলে যান। আমিও যাচ্ছি।'

ডাক্তার মাসুদ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধানমণ্ডিতে পৌঁছলেন। মাহমুদ এল আরও কিছুক্ষণ পর। লালু সাদিয়াকে এক গ্লাস দুধ খাওয়ানর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। আবার বমি করেছে সাদিয়া। ওর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। অসম্ভব দ্রুত হয়েছে পাল্‌স্ রিট।

ডাক্তার ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ওনার কয়েকটা টেস্ট দরকার। এখন স্যালাইন দিতে হবে।'

মাহমুদ বলল, 'কি মনে হচ্ছে, ডক্টর?'

'ইউ অয়্যার রাইট। শি ইজ নট প্রেগন্যান্ট।'

'তাহলে?'

ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার মাসুদ। 'ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে...'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাহমুদ বলল, 'তবে কি, ডক্টর?'

'একটা গুরুতর অসুখ বাধিয়েছেন আপনার স্ত্রী।'

'আমরা কি করতে পারি এখন?'

ডাক্তার বললেন, 'ওনাকে আমাদের ক্লিনিকে নিয়ে চলুন। এখনই রক্ত নিতে হবে। স্যালাইন চলবে। কোন শক্ত খাবার দেয়া চলবে না। অস্থির হবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাহমুদের কাঁধে ভর দিয়ে সাদিয়া গাড়িতে উঠল।

রূপা বলল, 'তুমিও যাও না, মা!'

রাশেদা মুখ ঘোরাল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি জানি, বাবা! মাহমুদ তো আমাদের সাহায্য চায় না। হয়ত ভাবছে, আমরাই বিষ খাইয়েছি।'

ডাক্তার মাসুদকে বিদায় করে মাহমুদ নিজের গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসল। কঠিন মুখে তাকাল রাশেদার দিকে। 'তুমি বিষ খাওয়াতে পার, এতে আমার সন্দেহ নেই। তবে সাদিয়া বোকার মত সে-বিষ খাবে কিনা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে এসব কুতর্ক না করে ইচ্ছে হলে গাড়িতে উঠতে পার। রূপা, তুই ওঠ পেছনে। লালুকে বল স্যালাইনের ব্যাগটা ঠিকমত ধরে থাকতে।'

'আচ্ছা, ছোট আব্বা। তুমি তাড়াতাড়ি চল।'

একটু দ্বিধার পর রাশেদা মাহমুদের পাশের সীটে উঠে বসল। তীরের বেগে গেট পেরিয়ে গাড়ি ছুটল ধানমণ্ডির দু-নম্বর রাস্তা ধরে।

ডাক্তার মাসুদের ক্লিনিক মগবাজারে। সকাল ন'টার জমজমাট ভিড় ঠেলে ক্লিনিকে পৌঁছতে বেশ দেরি হচ্ছে। রিকশাওয়ালাদের ওপর রাগে ফেটে পড়ল মাহমুদ।

রূপা বলল, 'ছোট আব্বা, তোমার হাতে স্টিয়ারিং। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। রিকশাওয়ালাদের গাল দেবার অনেক সময় পাবে।'

ক্লিনিকে পৌঁছে মাহমুদ নিজেই সাদিয়াকে কোলে তুলে নিল। 'কেমন লাগছে এখন?'

'অস্পষ্ট স্বরে সাদিয়া বলল, 'ভাল।'

মাহমুদ বুঝতে পারছে, মিথ্যে বলছে সাদিয়া। ওর মুখে যেন কেউ হলুদ মাখিয়ে দিয়েছে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। ক্লান্তিতে বারবার বুজে আসছে চোখ। একটু একটু ঘামছে ও।

'কবে থেকে দুর্বল বোধ করছ?' জিজ্ঞেস করল মাহমুদ। সাদিয়া বলল, 'চার–পাঁচদিন হবে।'

ক্লিনিকের বিছানায় শুয়ে সাদিয়া কাঁপতে লাগল। ডাক্তার মাসুদ ওর শরীর কম্বলে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'মেয়েদের দোষ হচ্ছে, ওরা সবসময় রোগ চেপে রাখে। অসুবিধেগুলোর কথা প্রকাশ করতে চায় না।'

মাহমুদ বলল, 'ডক্টর, কি মনে হচ্ছে? অনেক দেরি হয়ে গেছে? খুবই জটিল হয়েছে ব্যাপারটা?'

ডাক্তার তাঁর সহকারীদের কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলেন সাদিয়ার বেডের কাছে। বিব্রতভাবে বললেন, 'একটু দেরি হয়েছে···কিন্তু···ভয়ের কিছু নেই। তবে সাবধান থাকতে হবে। রক্ত পরীক্ষার পর সব বুঝিয়ে দেব। চিন্তা করবেন না।'

সাদিয়া অন্তঃসত্ত্বা নয়—জেনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রাশেদা। রূপার কানে ফিসফিস করে বলল, 'কঠিন রোগ বাধিয়েছে মেয়েলোকটা। এবার বুঝবে, কত ধানে কত চাল!'

রূপা ধমকের সুরে বলল, 'থাম তো, মা! এসব শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।'

'ঢঙ দেখ মেয়ের!' মুখ সিঁটকে রাশেদা বলল, 'হঠাৎ মেয়েলোকটা তোকে যাদু করেছে, মনে হচ্ছে!'

রূপা রূঢ় স্বরে বলল, 'অমন অসুখ আমার হতে পারে, এমনকি তোমারও···'

রাশেদা বাধা দিয়ে বলল, 'বালাই! ষাট! আমরা কি কারও বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি? সে যাক, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখ, কখন ওকে বাসায় নিয়ে যাব।'

ডাক্তার মাসুদ বেশ কয়েক মিলিলিটার রক্ত নিয়ে বললেন, 'ওনাকে বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন না। এখানেই থাকতে হবে ওনাকে।'

রাশেদা অসন্তোষের সঙ্গে বলল, 'কেন, বাসায় অসুবিধে কি? নার্স-আয়া রাখা হবে। কাজের লোকেরা আছে। আমরা সবসময় চোখে চোখে রাখতে পারব। দিনে দশবার ক্লিনিকে ছুটবে কে?'

যাহমুদ রুমালে মুখ মুছে বলল, 'অন্তত তোমার আর ছোটাছুটি করার দরকার নেই। আমি একাই ওর জন্যে যথেষ্ট। রূপার ইচ্ছে হলে ও আসবে। তুমি ভেব না, ভাবী।'

রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে হাজির হলেন ডাক্তার মাসুদ। গম্ভীর মুখে বললেন, 'যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা-ই হয়েছে।'

মাহমুদ বলল, 'বুঝলাম না, ডক্টর।'

'ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস। বিলোরুবিন ফোর পয়েন্ট টু।'

চমকে উঠল মাহমুদ। কি বলছেন, ডক্টর!'

'ইট ইজ ট্রু। আপাতত স্যালাইন চলবে। তার সঙ্গে শুধু ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স দেয়া হবে। অন্য কিছু নয়। এরপর অবস্থার উন্নতি হলে অন্য খাবার দেবার পরামর্শ দেব।'

রূপা শূন্য দৃষ্টিতে ডাক্তার মাসুদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার মাসুদ ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'ডোন্ট গেট আপসেট। উনি ভাল হয়ে যাবেন। চাচাকে তো "ছোট আব্বা" বলে ডাক। চাচীকে কি বলে ডাক তুমি? "ছোট মা" নিশ্চয়ই!'

রূপার চোখ ছলছল করে উঠল। ছোট মা বলে ডাকতে পারলে ভালই হত। কিন্তু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে সব। কোথায় যেন বীণার তার ছিঁড়ে গেছে। সে-তার নতুন করে বাঁধতে চায় রূপা, পারে

না। তবে একটা ব্যাপারে ওর সংশয় ঘুচে গেছে। ওর ছোট আব্বার বউটি খারাপ নয়। এ-বাড়িতে ওর আসন টলবে না। কিন্তু মায়ের প্রভাবটাও অস্বীকার করতে পারে না রূপা। সাদিয়ার কোলে সন্তান এলে হয়ত সবকিছু নতুন করে ভাবতে হবে। নিজেকেই ওই আসন ছেড়ে দিতে হবে। পৃথিবীর কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

ক্লিনিকের নিজস্ব ডিসপেনসারিতে 'ফিডাপ্লেক্স' নেই। প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে একজন কর্মচারী গোটা আউটার সারকুলার রোড ঘুরে এল। ওষুধটা পাওয়া গেল না।

মাহমুদ রাশেদাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ল ওষুধের খোঁজে। ক্লিনিকের লোকজন পরামর্শ দিয়েছে পিজি হাসপাতালের কাছে খুঁজতে। কিন্তু পিজি হাসপাতাল এলাকার আশেপাশের পনের-ষোলটা দোকান ঘুরেও ওষুধটা পাওয়া গেল না। একটা স্টোরের ক্লার্ক বলল, 'খুব জরুরী ওষুধ হঠাৎ করেই বাজার থেকে লাপাত্তা হয়ে যায়। মেডিকেল কলেজ কিংবা চান খাঁর পুলের দোকানগুলোতে খুঁজে দেখতে পারেন। তা-ও যদি না পান, মিটফোর্ডে চলে যাবেন। গাড়ি আছে, আপনাদের আর অসুবিধে কি?'

লোকটা বোঝে না, গাড়ি নিয়ে মিটফোর্ডে যাওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ। মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল এলাকায় ঢুকে পড়ল। শিক্ষকদের কোয়ার্টার্স-এর সামনে গাড়ি রেখে রিকশায় চেপে ছুটল মিটফোর্ডের উদ্দেশে। কয়েক বোতল "ফিডাপ্লেক্স" যোগাড় করে ফিরল ঘন্টাদুয়েক পর।

রাশেদা চলে গেছে। রূপা বসে আছে সাদিয়ার বেডের পাশে, ওর হাতে তালের পাখা। লালু কেবিনের বাইরের একটা টুলের ওপর বসে ঢুলছে।

'তোরা যাসনি?'

লালু চমকে উঠে চোখ কচলায়। 'না, ছোট স্যার। মেমসায়েব ভালা হওনের আগে যামু না।'

'কি খবর, রূপা?'

রূপা ফিসফিস করে বলল, 'একটু ভাল।'

'লালুর সঙ্গে বাসায় যাও। বিশ্রাম নাও। খাওয়াদাওয়ার পর এ... আমি অপেক্ষা করব।'

'তুমি যাবে না, ছোট আব্বা?'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়। তোমার মা ভেবে সারা হবে।'

রূপা আরও কিছুক্ষণ থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সাহস পেল না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ও।

নার্স এসে ফিডাপ্লেক্স-এর বোতল খুলে স্যালাইনের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। সাদিয়া চোখ মেলে দেখল, বোতলের স্বচ্ছ স্যালাইনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হলুদ রঙের তরল পদার্থ। কয়েক মিনিট পর আরও খানিকটা শক্তি ফিরে পেল সাদিয়া। ম্লান হেসে মাহমুদের দিকে তাকাল ও।

মাহমুদ হাসল। 'কেমন আছেন?'

প্রায় নিঃশব্দে সাদিয়া বলল, 'ভাল। কয়েক ঘন্টা আগেও বুঝতে পারিনি, অসুখটা তাড়াতাড়ি এত খারাপ মোড় নেবে।'

সাদিয়ার চোখ হলুদ হয়ে গেছে। মুখের ত্বকে অদ্ভুত সঙ্কোচন। অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। ভালভাবে কথা বলতে পারছে না। হাঁপাচ্ছে বিষম।

'আপনি...আপনি বারবার আমাকে...মৃত্যুর হাত থেকে...'

মাহমুদ বলল, 'কথা বলবেন না। যেখান থেকে যতটুকু শক্তি

পান, তা নিজেকে বাঁচানর কাজে ব্যয় করুন। কৃতজ্ঞতা জানানর সুযোগ অনেক পাবেন।'

'তলপেটে ব্যথা করছে।'

মাহমুদ ডাক্তার মাসুদের চেম্বারে ঢুকল। ফাঁকা ঘর। পিওন বলল, 'উনি বাসায় গেছেন, স্যার।'

মাহমুদ ডাক্তারের বাসায় টেলিফোন করে স্যাদিয়ার ব্যথার কথা জানাল।

'বমি-বমি ভাবটা কি এখনও আছে?' জানতে চাইলেন ডাক্তার [illegible]দ।

[illegible], ডক্টর।'

ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই। আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি। নার্সকে বলুন স্যালাইনের ডোজ বাড়িয়ে দিতে।'

নার্সকে ডেকে সাদিয়ার কেবিনে ফিরে এল মাহমুদ।

সাদিয়া বলল, 'কি বললেন ডাক্তার?'

'ভয় পেও না। উনি আধঘন্টার ভিতরেই আসবেন। তোমার স্যালাইনের ডোজ একটু বাড়াতে হবে। এই যে, নার্স এসে গেছে।'

নার্স স্যালাইন ব্যাগের এক ফুট নিচে ঝোলান বোতাম আঁকড়ে ধরল। সাদিয়া তাকিয়ে আছে অপলকে। আঙুল দিয়ে বোতামটা ওপরের দিকে ঘোরাতে লাগল। ব্যাগ থেকে যে-ফোঁটগুলো নলের মুখে পড়ছিল, সেগুলোর গতি দ্রুততর হল।

'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

মাথা নেড়ে সাদিয়া বলল, 'না। আপনাদের হয়রানির কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে।'

'নো মেনশন। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছি।'

জানালার পর্দার ফাঁক বেয়ে এক ফালি রোদ পড়েছে মাহমুদের মুখে। চমৎকার দেখাচ্ছে সুপুরুষ লোকটিকে। তার এত আন্তরিকতা আর ঐকান্তিক সেবার মূল্য দিতে পারেনি সাদিয়া। একটু একটু করে ও নিজেকে বুঝতে পারছে। অনেক দেরি হয়েছে। চলে গেছে এই ছোট জীবনের অনেকগুলো মূল্যবান দিন। এত কষ্ট পাওয়া আর দেবার কোন মানে হয় না। এবার অভিনয়ের আড়ালটা তুলে দিতে হবে। জীবনের সাইক্লোনে ভাসতে থাকা নৌকাটাকে এবার কূলে ভিড়িয়ে নিতে হবে। সাদিয়ার কানে যেন এখনও বাজছে সেদিন রাতে শোনা গানের কলিগুলোঃ "কান্দো কেনে মন রে আমার, কান্দো কেনে মন?/ আন্ধার আলোর এই যে খেলা, এই তো জীবন…"

কিন্তু কে প্রথম এগিয়ে আসবে? ও আসতে পারে না? কেন একবার জোর করে অধিকার আদায় করে না ওই লোক? কেন একবার ডাক দেয় না?

শরীরের সব যন্ত্রণা ছাপিয়ে অপূর্ব এক আনন্দে ওর শরীর-মন প্লাবিত হল যেন। নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করেছে ও। "আমি চিনেছি আমারে, আজকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ…"

আর একটু সুস্থতা চাই। একটু বেশি শ্বাস নিতে পারার সামর্থ্য, আর একটু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের ক্ষমতা দরকার। মাহমুদকে অনেক কথা বলার আছে। অনেক স্বপ্ন হৃদয়ের অচেনা গভীর কোণে লুকিয়ে ছিল। সেইসব স্বপ্ন ফুল হয়ে ফুটে উঠছে। একটু সময় চাই ফুলগুলো তুলে মালা গাঁথার। অতীতের কথা ভেবে সাদিয়ার হাসি পাচ্ছে। গোধূলির সিঁদুরে মেঘকে আগুন ভেবে ভয় পেয়েছিল একদিন। এখন ও সত্যিকার আগুনের আঁচ পাচ্ছে যেন। সাধ হচ্ছে সে-আগুনে পুড়ে মরতে।

চিন্তার ঘোড়া বড় দ্রুত ছুটেছিল। সাদিয়া হঠাৎ বুঝতে পারল, ভীষণ হাঁপাচ্ছে ও। মাহমুদ ওর মুখের কাছে মুখ সরিয়ে আনল।

'খুব কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তারকে আর একবার ডাকব?'

'না। তুমি আমার কাছে থাক। ডাক্তার চাই না, ওষুধ চাই না। শুধু তোমার সঙ্গ চাই। শুধু তোমাকে...'

তোমাকে!

সাদিয়া সত্যিই ওই কথাগুলো উচ্চারণ করেছে? শুনতে ভুল হয়নি তো? সাদিয়া কি জ্বরের ঘোরে কথা বলছে? ওর কপালে হাত দিল মাহমুদ।

সাদিয়া একটু দম নিল। ম্লান হেসে বলল, 'আমি ভুল বকছি না, মাহমুদ। আমি শুধু আমার ক্লান্তিটুকু প্রকাশ করছি।'

'কেন ক্লান্ত হয়েছ?'

'অভিনয় আর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এ-বোঝা আর বইতে পারছি না। নামিয়ে দেবে? দাও না!'

মাহমুদ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি ভাল হয়ে ওঠ।'

ডাক্তার মাসুদ প্রায় ছুটতে ছুটতে কেবিনে ঢুকলেন। 'নো! নো এত কথা বলা চলবে না। খান সাহেব, এবার আপনি বাসায় যান পেশেন্ট আমার দায়িত্বে থাকবে।'

সাদিয়া মনে মনে বলল, 'রাগ কর না, ডাক্তার। আমাদের কথা বলা যে এই মাত্র শুরু হল! শুরু হল আমাদের পথ চলা!'

মাহমুদ বলল, 'ও. কে., ডক্টর। আপনি ওর সমস্যাটা দেখুন। আমি যাই। সত্যিই পেশেন্ট বেশি কথা বলছে।'

মাহমুদ বাইরের দিকে পা বাড়াল। সাদিয়ার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল যেন। নীরবে কেঁদে উঠল ও। 'যেও না, মাহমুদ। তুমি

কাছে না থাকলে আমি মরে যাব। দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কিছু নেই। তুমি যেও না।'

বাইরে গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে-শব্দ। মাহমুদ চলে গেছে। নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ল সাদিয়া। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারল না।

'আপনার শরীরে টেম্পরেচার তো ঠিকই আছে, মিসেস খান!' বিস্ময়ের সঙ্গে ডাক্তার মাসুদ বললেন, 'কাঁপছেন কেন তবে? ভয় লাগছে?'

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সাদিয়া বলল, 'ডাক্তার সাহেব, কখনও ভালবেসেছিলেন কাউকে?'

রাশেদা নিজের ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠল। তার বিছানার ওপর দুটো পা নড়ছে। বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে আগন্তুক। আশ্চর্য! স্পর্ধা তো কম নয়!

সুইচ টিপে আলো জ্বালল রাশেদা। তারপর হাসতে হাসতে আগন্তুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'তুমি! এখানে···হঠাৎ···কি ব্যাপার?'

আব্দুল জব্বার একই ভঙ্গিতে বসে রইল। মুখে অদ্ভুত হাসি।

'খবর শুনেছ?'

জব্বার বলল, 'হুঁ। তোমার খাস বাঁদী···মানে নিসারের মা···সব বলেছে আমাকে। শী ইজ অ্যান ইনটেলিজেন্ট উওম্যান। তা···বেশ নাটক জমিয়ে তুলেছ তোমরা! কি বল?'

'বাজে কথা রাখ। মেয়েলোকটার অবস্থা মর-মর।'

বিচিত্র দৃষ্টিতে আব্দুল জব্বার রাশেদার দিকে তাকাল। 'খুব

নিশ্চিন্তে আছ, মনে হচ্ছে! ধরেই নিয়েছ যে দু-চারবার বমি করেই জলজ্যান্ত সুন্দরী মেয়েলোকটা পটল তুলবে! বাঃ বাঃ, দারুণ বুদ্ধি! নিসারের মা-ও তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে।'

রাশেদার দু-চোখে যেন আগুন ঝরছে। 'তোমার মতিগতি সুবিধের নয়, জব্বু। শেষ পর্যন্ত নিসারের মা'র দিকে তোমার চোখ পড়েছে! দুনিয়ায় এত মেয়েলোক থাকতে তুমি কিনা…'

হি হি করে হাসল জব্বার। 'তোমাকে একটু পরখ করছিলাম, ডার্লিং। দেখছিলাম, সত্যিই তুমি আমাকে ভালবাস কিনা।'

'কি দেখলে?'

আব্দুল জব্বার রাশেদার হাত ধরে টেনে পাশে বসাল। 'নিসারের মায়ের ব্যাপারে যেভাবে জেলাস হয়ে উঠলে, তাতে আর সন্দেহ করা চলে না। সত্যিই তুমি অত্যন্ত ভালবাস আমাকে।'

অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে রাশেদা বলল, 'কিন্তু ভালবেসে কি পেলাম! তুমি তো আমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছ! এখন নতুন শর্ত জুড়েছ, রূপাকে সিনেমায় নামাতে চাও। রূপা চিত্রনায়িকা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তা না হলে তুমি আমাকে অবহেলা করবে, এটা মেনে নিতে পারছি না। এদিকে রূপার মতিগতি বোঝাই দায়! ও যে কখন কি ভাবে…!'

আব্দুল জব্বার বলল, 'খুবই স্বাভাবিক। এ-বয়সের মেয়েরা অস্থিরচিত্ত হয়েই থাকে। একটা ছবি সুপারহিট হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তোমাকে অবহেলা করছি, কে বলল? মাহমুদ খান চায় না, আমি এখানে আসি। দেখা হয়ে গেলে সে আমাকে অপমান করবে। তবু তো আমি এসেছি। শুধু তোমার জন্যে, ডার্লিং।'

'তোমার গাড়ি কোথায়? পর্চে তো দেখলাম না…'

'ইয়ে···এক বন্ধু···ধার নিয়েছে একদিনের জন্যে। বিয়ে। বিয়ে করতে যাচ্ছে। তা···কি আর করব···দিয়ে দিলাম। এখন নিজে হেঁটে বেড়াচ্ছি। যাক ওসব কথা। তোমার নতুন অংশীদারের কথা বল। কি হয়েছে সেই পরমাসুন্দরীর?'

'ডাক্তার বলল, ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস।'

'ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস!' সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল জব্বার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'জণ্ডিস!'

রাশেদা বলল, 'এত খুশি হবার কারণ কি? একটু আগেই যে বললে, আমার নিশ্চিন্ত থাকাটা নির্বুদ্ধিতা!'

ক্রুর চোখে আব্দুল জব্বার রাশেদার দিকে তাকাল। মুখ সরিয়ে আনল রাশেদার কানের কাছে। 'একটা প্ল্যান খেলেছে মাথায়।'

'কিসের প্ল্যান?'

'আপদ বিদায় করার।'

রাশেদার পাল্‌স্ বিট বেড়ে গেল। 'মানে!'

'কে দেখাশোনা করছে?'

'কেন···সবাই তো আছে! মাহমুদ, রূপা, লালু, আমি···তা ছাড়া ক্লিনিকের ডাক্তার, নার্স, আয়া···'

অসহিষ্ণু হয়ে জব্বার বলল, 'আহা, সে-কথা নয়! কে রোগীর কাছে সবচেয়ে বেশিক্ষণ থাকছে?'

'মাহমুদ নিজেই।'

আব্দুল জব্বার ভাবনায় ডুবে গেল। রাশেদা ছটফট করছে জব্বারের বাকি কথাগুলো শোনার জন্যে।

'এক কাজ কর, ডার্লিং। ওই দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নাও। নিজের বাহ্যিক আচার-আচরণ বদলে ফেল। যেন অত্যন্ত নিষ্ঠা আর

আন্তরিকতার সঙ্গে রোগীর সেবা করছ, এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হও ওর সঙ্গে।'

রুদ্ধশ্বাসে রাশেদা বলল, 'তারপর?'

'আরও কয়েকদিন ধরে সুন্দরীর শরীরে স্যালাইন পুশ করা হবে। তবে আমাদের দেরি করা উচিত হবে না। আজ কিংবা কালকের মধ্যেই অপারেশনটা সেরে ফেলতে হবে।'

'অপারেশন!' শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে রাশেদা জব্বারের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে শূন্যতা।

জব্বার কিছুটা ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'নাহ্! তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কোন কথাই সহজে তোমার মাথায় ঢোকে না।'

'দোহাই, লক্ষ্মীটি, একটু বুঝিয়ে বল।'

দরজায় খুট্ করে শব্দ হল। চমকে সেদিকে তাকাল ওরা। না, মনের ভুল। কেউ নেই। নিসারের মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। আব্দুল জব্বারকে দু-বার চা খাওয়াতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করেছে সে। এখন যথাসময়ে দুপুরের খাবার তৈরি করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। আর কেউ নেই বাসায়। ক্লিনিক থেকে ওরা ফিরে এলে গাড়ির শব্দ পাওয়া যেত।

তবু গলার স্বর নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে জব্বার বলল, 'আমি তোমাকে ইনসুলিন জোগাড় করে দেব। স্যালাইন থামিয়ে সেই ইনসুলিন তুমি রোগীর শরীরে পুশ করবে। মাহমুদ বিধবা হয়ে যাবে, কোন সন্দেহ নেই, হি হি হি...'

রাশেদা ভয়ে কাঁপতে লাগল। 'আমি পারব? আমি...পারব?'

ধমকের সুরে জব্বার বলল, 'আস্তে কথা বল! দেয়ালেরও কান আছে।'

'আমার ভয় করছে।'

রাশেদার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিল জব্বার। 'ঘাবড়াও মাৎ! সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি তো আর ওর গলায় ছুরি বসাচ্ছ না! শুধু স্যালাইনের বোতাম নিচের দিকে ঘুরিয়ে ইনফিউশ্‌ন্ বন্ধ করবে।'

'তারপর?'

'তারপর ইনসুলিনের সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে দেবে।'

'আমি···আমি তো···ওসব পারি না···কোনদিন শিখিনি।'

'আহ্! উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আস্তে কথা বল। ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন পুশ করা এক কেতলি পানি গরম করার চেয়েও সহজ কাজ। ভয় পেও না। নার্সকে লক্ষ করবে। দরকার হলে বুদ্ধি করে হাতে-কলমে শিখে নেবে ওর কাছ থেকে। তুমি তো আর একটু হলেই জননন্দিত চিত্রতারকা হয়ে যেতে! অভিনয়ে তুমি কতখানি পটু, তা কি আমি জানি না? নিশ্চয়ই পারবে তুমি! নিশ্চয়ই পারবে!'

রাশেদার বুকের ভিতর প্রচণ্ড আলোড়ন হচ্ছে। সত্যিই কি সম্ভব ওই কাজ?

নয়া

বেবিট্যাকসি গেটের সামনে দাঁড়াতেই সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল দারোয়ান। সালাম দিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, ম্যাডাম? আপনারা বেবিট্যাকসিতে আইলেন ক্যান? গাড়ি কই?'

'ছোট আব্বা পরে আসবেন। আমি আর লালু চলে এসেছি। ওখানে এখন ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। বিকেলে আবার যাব।'

দারোয়ান গেট খুলে বেবিট্যাকসি চালককে ইঙ্গিত করল ভিতরে যেতে কিন্তু লালু আর রূপা—দুজনেই ততক্ষণে নেমে পড়েছে। ভাড়া শোধ করে রূপা বলল, 'ভিতরে যাবার দরকার নেই, ড্রাইভার সাহেব।'

প্রচণ্ড শব্দ তুলে বেবিট্যাকসি চলে গেল। রূপা আর লালু পা বাড়াল পর্চের দিকে। দারোয়ান ভুল বুঝতে পেরেছে। ড্রাইভার রফি মিয়া আজ ওদের গাড়ি চালাচ্ছে না। সম্ভবত সে ছুটিতে আছে। গাড়ি চালাচ্ছেন ছোট স্যার নিজেই। তাই রূপা আর লালু বেবিট্যাকসি নিয়ে চলে এসেছে।

'আপা, নতুন মেমসায়েব কেমুন আছে?'

ক্লান্ত স্বরে রূপা বলল, 'একটু ভাল। তবে বিপদ কাটেনি।'

'আল্লায় হেরে বালা করব। বরো বংশের বালা মানুষ উনি। কি চমৎকার আদব-কায়দা! মাইনষেরে জানোয়ার মনে করে না। হের কাছে হগল মানুষ সমান।'

লালু রান্নাঘরে গিয়ে নিসারের মায়ের অগ্নিমূর্তি দেখতে পেল। 'আইছ, নবাবের পুত? খুব মজা কইর‍্যা ঘুইরা আইছ! অহন কামে হাত লাগাও।'

লালুর ইচ্ছে ছিল আগে বড় বেগমসায়েবের সঙ্গে দেখা করে নতুন মেমসায়েবের অসুখের বর্তমান অবস্থার কথা জানাবে। ডাক্তার কি কি ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলেছেন, সেটাও ওঁকে বলা দরকার। কিন্তু নিসারের মা'র মুড দেখে আর সাহস পেল না ও। তা ছাড়া রূপা যখন ওর মায়ের বেডরূমের দিকে এগিয়ে গেল, তখন নিশ্চিন্ত হল লালু। রূপা-ই সব জানাবে ওনাকে।

রাশেদার ঘরের দরজা সবসময় খোলা থাকে। রূপা যখন-তখন সে-ঘরে ঢোকে। কিন্তু আজ দরজাটা বন্ধ। কি করছে ওর মা? কাপড় পাল্টাচ্ছে? দরজায় টোকা দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রূপা। ভিতর থেকে চাপা ফিসফিসানির শব্দ আসছে। তর্ক-বিতর্ক চলছে। একটি গলা ওর মায়ের। অন্যটি কার? গলাটা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু একেবারে রাশেদার বেডরূমের ভিতরে নিচু স্বরে ওর সঙ্গে কে কথা বলতে পারে?

কৌতূহল দমন করা কঠিন হল। রূপা দরজার এক পাশে সরে দাঁড়াল। কান পাতল পর্দার গায়ে। ওর মায়ের গলাই কানে আসছে সবচেয়ে বেশি। জব্বার মামার কথা একটুও বোঝা যাচ্ছে না।

রাশেদা বলছে, 'আমি পারব? ...আমি পারব?'

কি পারবে? জব্বার মামা কোন কাজের দায়িত্ব দিচ্ছে ওর মা-

কে? রাশেদার কথা-ই বা কেন এমন আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে? রাশেদা ভয় পাচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই। কি সেই বিপজ্জনক কাজ?

রাশেদার পরের কথাগুলো আরও সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। 'আমি···আমি তো···ওসব পারি না···কোনদিন শিখিনি···'

রূপা আবার পাল্‌স্ বিট মিস্ করল। জব্বার মামার স্বরে অদ্ভুত রহস্য। ফিসফিস করে কথা বলছে সে। কি যেন শিখিয়ে দিচ্ছে রাশেদাকে। কিসের ষড়যন্ত্র চলছে? ব্যাপারটা জানা দরকার।

কিন্তু আর কিছুই জানতে পারল না রূপা। আব্দুল জব্বার উঠে দাঁড়াল। কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। ঘরের ভিতর থেকে চুমুর শব্দ ভেসে আসছে। রূপার শরীরের ভিতর অদ্ভুত এক শিহরণ ওঠে। কাঁপতে থাকে ও।

'কোথেকে কিনবে?' জিজ্ঞেস করল রাশেদা।

এবারের কথাগুলো আরও স্পষ্ট। আব্দুল জব্বারও স্পষ্ট স্বরে বলল, '"পার্কভিউ মেডিকেল হল" থেকে। ওখান থেকে কেনাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

'কোন ঝামেলা হবে না তো?'

'আরে দূর! অত ভয় পেলে চলে?'

রাশেদা বলল, 'আমি ক্লিনিকেই থাকব বেশির ভাগ সময়। এখানে আর এস না। সন্ধে ছ'টার দিকে আমার কাছে পৌঁছে দিও। খুব সাবধান! কেউ যেন টের না পায়। এখন যাও, লক্ষ্মীটি। মাহমুদ, রূপা, লালু—যে-কোন সময়ে ফিরে আসবে।'

আবার জাপটাজাপটির শব্দ। রূপা নিঃশব্দে দরজার কাছ থেকে সরে গেল। মাথায় অনেক ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে রান্নাঘরে পৌঁছল রূপা।

লালু সালাদ তৈরি করছে। প্লেট-গ্লাস ধুয়ে টেবিলে খাবার দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে নিসারের মা। রূপাকে দেখে একটু হাসল সে। 'অ! আপাও আইছেন নিকি? আমি তো ভাবছিলাম লালু একলাই ফিইর‍্যা আইছে। তা, আপনাগোর নতুন মেমসায়েবের কি অবস্থা?'

হঠাৎ রাগ হল রূপার। এ আবার কোন্ ধরনের কথা? কিন্তু কেন যেন ওর মনে হল, সময়টা খুব খারাপ। এখন রাগ করা ঠিক হবে না। রূপা কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে, নিসারের মা। তাড়াতাড়ি টেবিলে খাবার দাও।'

'এই তো···অহনই দিতাছি। অ্যাই ছোকরা, তারাতারি কাম শ্যাষ কর। সামান্য একটু কাজে তর কত টাইম লাগব?'

আব্দুল জব্বারকে বিদায় দিয়ে রাশেদা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। রূপা মাঝপথে তার গতিরোধ করল। রাশেদা চমকে উঠে বলল, 'কখন এলি তুই?'

'এই তো···'

'মাহমুদ, লালু—ওরা কোথায়?'

রূপা বলল, 'লালু রান্নাঘরে সালাদ বানাচ্ছে। ছোট আব্বা ক্লিনিকে। লালু আর আমি বেবিট্যাকসিতে চড়ে চলে এসেছি। কেন, মা? এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?'

বিরক্তির সঙ্গে রাশেদা বলল, 'ঘাবড়ে যাচ্ছি কোথায়? কি যে বলিস!'

'রাগ কর না, মা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কে এসেছিল?'

'কোথায় কে? তোর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে, রূপা।'

রূপা অতি কষ্টে হাসি গোপন করল।

'ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি···' কৈফিয়তের সরে রাশেদা বলল

'ইয়ে···রেডিও'র নাটক শুনছিলাম। তোদের বংশের ধারাই এমন, বুঝেছিস? সব কিছুতেই শুধু সন্দেহ! আর যদি কেউ এসেও থাকে, তোর উচিত নয় কিছু জিজ্ঞেস করা। সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

আহত স্বরে রূপা বলল, 'ঠিক আছে, মা। কিছুই জানতে চাই না।'

নিসারের মা এসে বলল, 'বড় বেগম সায়েব, টেবিলে খানা দিছি।'

নতুন করে গভীর ভাবনায় ডুবে যায় রূপা। জব্বার মামা এসেছিল—এই কথাটা মা ওর কাছে অস্বীকার করেছে। তার মানে অন্য কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু রহস্যটা তো ভেদ করা চাই!

খাওয়ার পর নিজের কামরায় শুয়ে বার বার কথাটা ভাবছে রূপা। পার্কভিউ মেডিকেল হল-এর নাম এর আগেও শুনেছে ও। দোকানটা জব্বার মামার এক বন্ধুর। সম্ভবত ওই ব্যবসায়ে জব্বার মামার শেয়ার আছে। একবার কথায় কথায় সে বলেছিল, শেয়ারটা রূপার নামে ট্রান্সফার করা হবে। কিন্তু কোথায় ওই দোকান? ওখান থেকে কি সংগ্রহ করবে জব্বার মামা? মা'র হাতেই বা কেন দেবে? মা কি করবে সেটা নিয়ে? অসংখ্য প্রশ্ন আসছে মাথায়। এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না কারুর কাছ থেকেই। কিন্তু রূপাকে ওরা চেনে না! দাঁতে দাঁত ঘষল রূপা।

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে উঁকি দিতেই রূপা এক লাফে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ড্রইং রুম থেকে বার করে আনল টেলিফোন ডাইরেকটরি। ঠিকানাটা ওখান থেকেই পাওয়া যাবে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেল পার্কভিউ মেডিকেল হল–এর ঠিকানা। ওষুধের দোকানটা ভিকটোরিয়া পার্কের কাছেই–রাস্তার পুবদিকে কোন এক জায়গায়। বাকিটুকু খুঁজে নিতে হবে ওখানে গিয়ে।

সন্ধে ছ'টার মধ্যে জিনিসটা রাশেদার কাছে পৌঁছবে। তার মানে পাঁচটার মধ্যেই জব্বার সেখানে পৌঁছবে। রূপা আরও আগে চলে যাবে ভিকটোরিয়া পার্ক এলাকায়। অপেক্ষা করবে জব্বারের জন্যে। তারপর জব্বারের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে দেখবে কি সংগ্রহ করছে সে!

কোন একটা নিষিদ্ধ কিংবা বিষাক্ত ওষুধ সংগ্রহ করবে জব্বার মামা। এ–ব্যাপারে রূপার সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। ওরা কি করবে ওষুধটা নিয়ে? কেন এত গোপনীয়তার সঙ্গে সংগ্রহ করা হচ্ছে ওটা?

লালু এঁটো প্লেট–গ্লাস ধুচ্ছে। রান্নাঘরের পাশেই স্টোর রুম। সেখানে একটা মাদুর পেতে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে নিসারের মা। রূপা ইঙ্গিতে লালুকে ডাকল।

লালু হাত মুছে উঠে এল। নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে রূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা উপকার করবে, লালু?'

লালু রূপার মুখে কখনও এত মিষ্টি কথা শোনেনি। তখনই গলে গেল যেন। 'কন, আপা, কি করতে অইব।'

'একটা বোরখা যোগাড় করে দিতে হবে।'

'বোরখা!' যেন আকাশ থেকে পড়ল লালু।

'হ্যাঁ। কাউকে বলা চলবে না। এখনই দরকার।'

মাথা চুলকে লালু বলল, 'নিসারের মায়ের একখান বোরখা আছে। আপনে চাইলেই হে দিয়া দিব।'

'উঁহুঁ,' মাথা নেড়ে রূপা বলল, 'তুমিই যোগাড় করে দাও। নিসারের মা যেন না জানে যে বোরখাটা আমি চাইছি।'

'তাইলে ওনারে কি কমু?'

'বলবে, তোমার একজন আত্মীয়া বোরখাটা চাইছেন। আজই সন্ধের পর ফেরত পাওয়া যাবে।'

লালু নিসারের মায়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে। 'কি অইছে? ধাক্কা দ্যাস ক্যান্?'

'তোমার বোরখাডা একটু দিবা?'

ঘুম-জড়ান গলায় নিসারের মা বলল, 'বোরখা দিয়া তুই কি করবি?'

'আমার চাচী আছে না···হেই তিন নাম্বারে··কর্নেল রেজোয়ান সায়েবের বাসায়···'

'হ, তা কি অইছে?'

'হে মাইয়ার বাসায় যাইব। তোমার বোরখাডা দাও। সইন্দার পর আইন্যা দিমু।'

'খুব বিরক্ত করতাছস, ছোকরা। যা, হেই আলনার উপরে আছে। লইয়া যা। সইন্দায় যুদি ফেরত না আনস, তরে পিটাইয়া লাশ বানামু, কইলাম। অহন যা, আমারে ঘুমাইতে দে। বেগম সায়েব চা চাইলে বানাইয়া দিস।'

'আইচ্ছা।'

বোরখা জোগাড় হল। চারটের দিকে একটা ছোট হাতব্যাগে বোরখা পুরে বেরিয়ে পড়ল রূপা।

'কই যাইতাছেন, আপা?' দারোয়ান জিজ্ঞেস করল।

'বান্ধবীর বাসায়। সন্ধের পর ফিরব।'

দারোয়ান দুঃখিত স্বরে বলল, 'ড্রাইভার ছুটিতে গিয়া আপনাগোরে বহুত পেরেশানির মইদ্যে ফালাইছে। রিকশা ডাইক্যা দিমু, আপা?'

'উঁহুঁ, কোন দরকার নেই। ওই···জিগাতলার কাছে যাব আমি। রিকশা লাগবে না। তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই।'

কিছুদূর এগিয়ে চারদিক দেখে একটা রিকশা নিল রূপা। এতক্ষণে ভয় ঢুকেছে মনে। সবকিছু ঠিকমত হবে তো? আসবে না তো কোন বিপদ? কিন্তু পথে নামার পর ওসব ভেবে লাভ নেই।

একটা রিকশা এসে ওর পাশে দাঁড়াল। 'কই যাইবেন, আপা?'

'ভিকটোরিয়া পার্ক।'

'কোর্ট–কাচারির কাছে যাইবেন তো? লন, যাই। বারো টাকা লাগব।'

রূপা উঠে পড়ল। নিউমার্কেট আর আজিমপুর কলোনী পার হয়ে রিকশা যখন বাঁয়ে মোড় নিল, রূপা ব্যাগ থেকে বার করল বোরখা। বোঁটকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দেবার উপায় নেই এখন। রূপা রিকশায় বসেই বোরখা পরে নিল।

কোর্টের বিপরীতে সিনেমা হলের পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল রূপা। আরমেনিয়ান গির্জা বাঁয়ে রেখে একটু এগোতেই চোখে পড়ল পার্ক ভিউ মেডিকেল হল। একটু সামনে গিয়েই রিকশা থামাল রূপা।

ভাড়া নেবার সময় হঠাৎ চমকে ওঠে রিকশাওয়ালা। এক ফুটফুটে আধুনিকা মেয়ে কখন এমন ভুতুড়ে বোরখাওয়ালীতে রূপান্তরিত হল, ভেবে পাচ্ছে না সে।

'কলিকালে আল্লায় যে আরও কত কি দেখাইব!' বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল রিকশাওয়ালা। রূপা চারদিকে তাকাল। জব্বার

মামার লাল টয়োটা নেই কোথাও। হয় সে এখনও আসেনি, নয় তো প্রয়োজনের জিনিসটা সংগ্রহ করে ফিরে গেছে। যদি শেষের অনুমান সত্যি হয়, তো ওর সব কষ্ট বৃথা। কিন্তু এখন প্রথম অনুমানটাকে আঁকড়ে ধরাই বুদ্ধির কাজ হবে।

এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে বেশ কিছুটা সময় কাটাল রূপা। জব্বার মামার দেখা নেই। রূপা বুঝতে পারল, এভাবে ঘোরাফেরা করাও নিরাপদ নয়। যে কোন সময় মতলববাজ লোক এসে জুটতে পারে।

রূপা রাস্তা পার হয়ে কোর্টের সামনে চলে এল। ফেরিওয়ালারা পুরনো কাপড় বিক্রি করছে। একটা জ্যাকেট কিনলে কেমন হয়?

একটা গোলাপী জ্যাকেট বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

'কত দেব, ভাই?'

'এক দাম কমু? দুইশ পঁচিশ টেহা।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার অপর দিকে দৃষ্টি রাখছিল রূপা। জব্বার মামার লাল টয়োটা এগিয়ে আসছে। জ্যাকেট কেনা আর হলো না। দ্রুত পা বাড়াল রূপা।

ফেরিওয়ালা তেড়ে এল। 'কি অইল? দর না কইর‍্যা কই যাইতাছেন?'

রূপার হাতে সময় নেই। বলল, 'শুধু পঁচিশ টাকায় দিবেন?'

ফেরিওয়ালা মুখ বিকৃত করে জ্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলল তার বাক্সের ওপর। 'এইসব মাল ফকিরনীগো লেইগ্যা আনি নাই। এইগুলি কিনতে ট্যাকা লাগে!'

রূপা মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে ছুটল। রিকশা আর গাড়ির ধাক্কা এড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ডে পার হল ব্যস্ত

রাস্তাটা।

আব্দুল জব্বার গাড়ি পার্ক করল দোকানের সামনে। রূপা ততক্ষণে কাউন্টারে পৌঁছে গেছে। স্বর বিকৃত করে ও বলল, 'দশটা প্যারাসিটামল দেন তো, ভাই!'

কর্মচারীটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের একটা পাতা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ছয় টাকা।'

ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করল রূপা। টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। টাকা খুঁজে বার করতে তার আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। জব্বার এসে দাঁড়াল রূপার পাশ ঘেঁষে। রূপার গা যেন রিরি করে ওঠে। এমন অসভ্য লোকটাকে ওর মা কিভাবে সহ্য করে, ভেবে পেল না ও।

কর্মচারীটি রূপার কথা ভুলে জব্বারের প্রতি মনোযোগী হল। 'স্যার, আপনি! হঠাৎ কি মনে করে···'

জব্বার বলল, 'মুজিবর রহমান কোথায়?'

'উনি তো সন্ধের পর আসেন, স্যার! কোন খবর আছে?'

'না, তেমন কোন খবর নেই। ইনসুলিন আছে? পাঁচশ ইউনিটের একটা বোতল দাও তো!'

কর্মচারী সিরিঞ্জসুদ্ধ একটা ইনসুলিন ইঞ্জেকশনের প্যাকেট সেলোফেন ব্যাগে মুড়ে ওর হাতে তুলে দিল। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করল জব্বার।

কর্মচারী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে, করছেন কি, স্যার? দাম দিচ্ছেন কেন? মুজিব সাহেব শুনলে রাগ করবেন। আপনার কাছ থেকে কি দাম নিতে পারি? দাম লাগবে না, স্যার।'

জব্বার গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'নিজের জন্যে যখন নিচ্ছি না, তখন দাম দেব না কেন? অন্যের জিনিস। তা ছাড়া আমি এটা

নিয়েছি, কাউকে বল না যেন। তোমাকে তো আবার হিসেব মিলাতে হবে!'

ফিসফিস করে আরও কয়েকটা কথা বলল জব্বার। কর্মচারীটি ছাড়া আর কেউ তা শুনতে পেল না। কথা শেষ করেই সে গাড়ির দিকে পা বাড়াল। রূপা দশ টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরল। তারপর এক টাকার চারটে নোট ফেরত নিয়ে একটা রিকশা ডাকল ও।

'মগবাজার যাবে?'

'মগবাজারের কোনখানে?'

'মাসুদ ক্লিনিক। ডাক্তার মুস্তাফিজুর রহমানের চেম্বারের পাশে।'

'হ্, যামু।'

সন্ধে নেমেছে। এই সময় ঢাকার রাস্তাগুলোয় প্রচণ্ড ভিড় জমে ওঠে। ডাক্তার মাসুদের ক্লিনিকে পৌঁছতে প্রায় একঘন্টা সময় লাগল। রূপা ভেবে পাচ্ছে না, জব্বার মামা ইনসুলিনের মত একটা নির্দোষ ওষুধ নিয়ে কার কি ক্ষতি করবে? ওর মা-ই বা কেন এত আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল ব্যাপারটা নিয়ে?

রূপা ইনসুলিন চেনে। ডায়াবেটিক রোগীদের ইনস্যুলিন দেয়া হয়। ওর বাবা-ও মৃত্যুর কিছুদিন আগে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে ইনসুলিন ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল।

'একটু জোরে চালাও রিকশাওয়ালা,' তাগাদা দিল রূপা।

রিকশার গতি বাড়ল। কিন্তু তাতে লাভ হল না। তোপখানার মোড়ে ভয়ানক যানজট। রিকশা সেখানে আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকল। সে-জটের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার ছুটল রিকশা। রূপা ভেবেছিল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মগবাজারে পৌঁছবে। কিন্তু

আরও বড় যানজট লেগেছে কাকরাইলে। কান্না পেল রূপার।

রাশেদা অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল ক্লিনিকের বারান্দায়। লাল রঙের গাড়ি দেখলেই চমকে উঠছিল। কেন এত দেরি করছে জবু মিয়া? ইনসুলিনও কি দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল? সব পরিকল্পনা কি তবে ভেস্তে গেল? একটা মিনিটও যেন আর কাটতে চাইছে না।

সাড়ে ছ'টার দিকে ক্লিনিকের গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল জব্বারের লাল টয়োটা। প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল রাশেদা।

'এনেছ?'

আব্দুল জব্বার সেলোফেনের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল। 'এই নাও। খুব সাবধান! যা যা বলেছি, সব মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ। চিন্তা কর না।'

আব্দুল জব্বার আর দেরি করল না। তীরের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। রাশেদা শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে এল কেবিনে।

সাদিয়া খুব কষ্ট পাচ্ছে। ওর মাথার কাছে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছে মাহমুদ। রাশেদা মনে মনে হাসল। মিথ্যে ওই সান্ত্বনা। কাল সকালে ওই বিছানাটা শূন্য হয়ে যাবে। মাহমুদের সমস্ত কষ্ট বৃথা।

'মাহমুদ!' মধুর স্বরে ডাকল রাশেদা, 'কেন এমন উতলা হচ্ছ, বল তো! ডাক্তার তো বললেন, ভয় কেটে গেছে! ও বেচারিকে আরও কিছুক্ষণ কষ্ট সহ্য করতে হবে। তুমি তো অনেক চেষ্টা করেছো ওর কষ্ট লাঘব করার! এখন একটু বাসায় যাও। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কি হবে, ভেবে দেখেছ?'

মাহমুদ ম্লান হেসে বলল, 'দেখেছি। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কি

হবে, জানি না। তবে আমি মারা গেলে তোমার অনেক সমস্যার সমাধান হবে।'

'মরণাপন্ন রোগীর পাশে বসে এসব কি বলছ, মাহমুদ? রাগ কর না, প্লিজ। এখন বাসায় যাও। রাতে বিশ্রাম নাও। ভাল করে ঘুমাও। আমি সাদিয়ার কাছে থাকব।'

মাহমুদ বলল, 'বাসায় শুয়ে উদ্বেগে ছটফট করার পরামর্শ দিচ্ছ কেন, ভাবী? তুমি অনেক কষ্ট করছ। আমি না হয় তোমাকে সঙ্গ দেব!'

ডাক্তার মাসুদ সাদিয়াকে পরীক্ষা করলেন। তারপর স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে বললেন, 'ভাবীর পরামর্শ মন্দ নয়, মাহমুদ সাহেব। আপনাকে খুবই কাহিল মনে হচ্ছে। এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না।'

রাশেদা তাড়াতাড়ি বলল, 'জানেন, ডাক্তার সাহেব, আমার হাজব্যাণ্ড যখন মারা যান, তখন আমি মনে মনে কষ্ট পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু শরীরে কোন অসুবিধে হয়নি। আর মাহমুদের ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে গিয়েছিল। আজও যদি তেমন কিছু ঘটে, আমাদের বিপদের কথা কল্পনা করতে পারেন? ডাক্তার সাহেব, আপনি ওকে বিশ্রাম নিতে বলুন, প্লিজ।'

ডাক্তার অনুনয়ের সুরে বললেন, 'এভরিথিং উইল বি অলরাইট, মিস্টার মাহমুদ। এবার আপনি বাসায় যান। নার্স সবসময় এখানে ডিউটিতে থাকবে। দু'জন অতিরিক্ত আয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর···ভাবী তো রইলেন!'

একজন অ্যাটেনডেন্ট কেবিনের সাদা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। 'বাসা থেকে টেলিফোন এসেছে।'

মাহমুদ উঠতে যাচ্ছিল। রাশেদা বাধা দিয়ে বলল, 'আমি ধরছি, মাহমুদ। এত ছোটাছুটি করলে তুমি সত্যিই মরে যাবে।'

রাশেদা ক্লিনিকের অফিস রুমের দিকে এগিয়ে গেল। তার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে আছে মাহমুদ। রাশেদার আচরণের এমন নাটকীয় পরিবর্তনের ব্যাপারটা কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকছে না।

সাদিয়া ধীরে ধীরে বলল, 'নিজের ওপর বিষম ঘেন্না হচ্ছে, মাহমুদ। তোমাদের সবাইকে বিপদে ফেলেছি। কাউকে কষ্ট দিতে আমার বড় খারাপ লাগে।'

মাহমুদ বলল, 'তুমি ইচ্ছে করে কষ্ট দাওনি। যারা ইচ্ছে করে অন্যকে কষ্ট দেয়, অনুশোচনা হওয়া উচিত তাদেরই।'

'কি মনে হচ্ছে, জান? ভাবী সত্যিই এখন অনুশোচনায় ভুগছেন। উনি বেশ যত্ন নিচ্ছেন আমার। সারাক্ষণ ডাক্তার, নার্স আর আয়াদের ব্যস্ত করে রাখছেন। হয়ত মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখতে পেয়ে ওর মনে পরিবর্তন এসেছে।'

গভীর ভাবনায় ডুবে গেল মাহমুদ। একবার মনে হয় সাদিয়ার অনুমান ঠিক। আবার মনে হয়, সবই ওই মেয়েলোকটির অভিনয়। কিন্তু সে যা-ই হোক, সাদিয়ার কোন ক্ষতি করা আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ডাক্তার আর নার্স সারাক্ষণ ওর দিকে দৃষ্টি রাখছে। রোগীকে ওষুধ খাওয়ানর অধিকারও অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। রাশেদা ওর কাছে থাকতে পারে। কিন্তু শুধু পাহারা দেয়া ছাড়া অন্য কিছু করার থাকবে না রাশেদার।

মাহমুদ বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল। কয়েক ঘন্টা সিগারেট খায়নি ও। সাতটা বাজে। সত্যিই খুব ক্লান্তি লাগছে। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে রক্তচাপ বেড়ে যাবে—এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মাহমুদ বাসায় ফিরে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো রাশেদা।

চমকে উঠলো মাহমুদ। সিগারেটটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। খাণ্ডারনী মেয়েলোকটা কাঁদছে! একটা দৃশ্য বটে! কি হয়েছে ওর?

মাহমুদের দু'হাত জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠল রাশেদা। 'রূপা···রূপাকে পাওয়া যাচ্ছে না, মাহমুদ।'

মাহমুদ আঁতকে উঠল। 'কি বলছ এসব?'

'লালু ফোন করেছিল। বলল, সন্ধের আগে বান্ধবীর বাসায় যাবার কথা বলে বেরিয়েছে। এখনও ফিরে আসেনি।'

'কোন্ বান্ধবীর বাসায়?'

'দারোয়ান বলেছে, জিগাতলার বান্ধবীর বাসায় গেছে ও। কিন্তু বাবলিদের বাসায় টেলিফোন করে ওরা জেনেছে, রূপা ওখানে যায়নি। এখন কি হবে, মাহমুদ? কোথায় গেছে আমার রূপা?'

মাহমুদ রাশেদার হাতে চাপ দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। 'আব্দুল জব্বার ওকে কোথাও নিয়ে যায়নি তো?'

'না। ও একটু আগেই এসেছিল। রূপা ওর সঙ্গে যায়নি।'

'আশ্চর্য!'

মাহমুদ ছুটল অফিস রূমে। একের পর এক টেলিফোন করল। রমনা, সূত্রাপুর আর মোহাম্মদপুর থানায় খোঁজ নিল। মেডিকেল আর আই পিজি এম আর-এর ইমারজেন্সিও বাদ দিল না। ডাক্তার মাসুদও খোঁজ নিলেন সব বড় ক্লিনিকগুলোতে।

রুমাল বার করে মুখ মুছল মাহমুদ। বলল, 'ভাবী, অধীর হয়ে কোন লাভ নেই। গত তিন-চার ঘন্টায় ঢাকার কোথাও কোন রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, কোন অপহরণের খবরও পাওয়া যায়নি। ধরে

নিতে হবে, রূপা ভালই আছে। কোন্ বান্দবীর বাসাতেই গেছে ও। হয়ত সে বান্ধবীর বাসায় টেলিফোন নেই।'

'না, আমার মন বলছে, মেয়েটা আমার...'

রাশেদার কথা অসম্পূর্ণ রইল। গাড়িবারান্দায় এসে থামল রূপার রিকশা। রাশেদা ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। 'কোথায় ছিলি তুই, হতভাগী? কেন এত কষ্ট দিলি?'

রূপা নির্বিকারভাবে বলল, 'এক বান্ধবীর বাসায় গিয়েছিলাম, মা।'

'কোথায় তার বাসা? বলে যাসনি কেন?'

'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, মা। এখন ঝামেলা কর না। খুব ক্লান্তি লাগছে। ছোট মা-কে একবার দেখে বাসায় ফিরে যাব।'

ঋজু, বেপরোয়া ভঙ্গিতে হেঁটে কেবিনের ভিতর ঢুকল রূপা। সাদিয়ার মাথার কাছে একটা খালি টুল পেল। তাতে বসে সাদিয়ার কপালে হাত রাখল ও। 'কেমন আছ, ছোট মা?'

বাইরের বারান্দায় জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল রাশেদা।

মাহমুদ বলল, 'এ-বয়সের ছেলেমেয়েদের নানান রকমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ম্যানেজ করতে হয় খুব সতর্কতার সঙ্গে। এখন ওর ওপর কোন জোর খাটিও না, ভাবী। বাসায় টেলিফোন করে ওদের জানিয়ে দাও, রূপা ভাল আছে। তারপর আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।'

ডাক্তার মাসুদ বললেন, 'সেই ভাল, মাহমুদ সাহেব। আপনারা টেলিফোনের কাজ সেরে নিন। আমি দোতলায় পোস্ট অপারেটিভের একজন পেশেন্টকে দেখব। পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'ও. কে., ডক্টর।'

অনেকদিন পর মাহমুদের সঙ্গে বসে রাতের খাবার খেল রূপা। জটিল ভাবনাগুলো কিছুতেই তাড়াতে পারছে না মন থেকে। ছোট মা-কে সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় দেখেছে। অথচ ইনসুলিনের সঙ্গে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে, এতে সন্দেহ নেই।

কথা বলতে বলতে বারবার অন্যমনস্ক হল রূপা। ছোট আব্বাকে যদি সব খুলে বলতে পারত! একবার বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তারপরই ভাবল, যদি ব্যাপারটা আদৌ গুরুতর কিছু না হয়ে থাকে, ওকে বকুনি খেতে হবে।

হঠাৎ মাহমুদ বলল, 'রূপা, তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাও, তাই না? একটুও সঙ্কোচ কর না। আমি শুধু তোমার অভিভাবকই নই, সবচেয়ে কাছের বন্ধু। মন খুলে বলতে পার।'

রূপা হেসে ফেলল। 'কি করে বুঝলে, ছোট আব্বা?'

'আমি তোমাকে ছোটকাল থেকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি। আমি তোমার অন্তরের কথা বুঝতে পারি।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল রূপা। 'আগে একটা প্রশ্ন করি, ছোট আব্বা। ইনসুলিন কোন্ কাজে লাগে বল তো!'

'ডায়াবেটিকের...'

বাধা দিয়ে রূপা বলল, 'ওটা জানি। অন্য কোন কাজে লাগে?'

একটু ভাবল মাহমুদ। তারপর হেসে বলল, 'মানুষ মেরে ফেলা যায়। যেমন ধর...তোমার ছোট মা'কে এখন স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। তার বদলে যদি ইনস্যুলিন দেয়া যায়...'

ডুকরে কেঁদে, চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল রূপা। 'ছোট আব্বা, এখনই ক্লিনিকে চল। হয়ত এরই মধ্যে সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

দশ

সাদিয়া স্বপ্ন দেখছিল, এক নতুন ভুবনে এসে পৌঁছেছে। প্রথমটায় বিষম নিঃসঙ্গ মনে হল নিজেকে। তারপর ভাবল, নৈঃসঙ্গ আসলে মনের এক ধরনের বিকার। ধীরে ধীরে গোটা পরিবেশ ওর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। সাদিয়া পাহাড় ভালবাসে। গোধূলির সিঁদুরে আলোয় সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও ভুলে যেতে পারে জীবনের সব দুঃখ–শোক। চমৎকার কোন শ্যামল বনের মাঝখান দিয়ে যে সরু নদীটি বয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে ডিঙিতে চড়ে ভাসতে ভাসতে ও ক্ষমা করতে পারে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুকে আর যদি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, তাতে ভিজতে ভিজতে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে জীবনের সব ছোট ছোট পরাজয়, ব্যর্থতা। জীবনের কাছে ওর চাওয়া খুব বেশি নয়।

পাহাড় ওর সঙ্গী হল। বন্ধুত্ব হল সমুদ্রের সঙ্গে। শ্যামল বনানী আর [redacted] ঝর্ণা ওকে হাতছানি দিল। ও একাত্ম হল বর্ষণমুখর অন্ধকারের সঙ্গে। তবু একসময় হঠাৎ মনে হল, সব শূন্য। কোথাও মস্ত ফাঁক আছে। ওর সব ভাললাগার উৎস আসলে একজন মানুষ। একজন প্রেমিক পুরুষ। সব সৌন্দর্যের মাঝে ও আসলে তাকেই খুঁজে

বেড়াচ্ছে। তাকে না পেয়ে হাহাকার করে উঠছে ওর মন।

নতুন ভুবনে পা দিয়ে উঁচু-নিচু পাহাড়ের গায়ে ও যেন বাবার সেই শিষ্যের পায়ের রেখা দেখতে পেল। চিৎকার করে ডাকতে গেল তরুণটিকে। কিন্তু কিছুতেই তার নামটা ওর মনে এল না। বালুবেলায় পৌঁছে দেখল, তরুণটি একা হেঁটে যাচ্ছে নিরুদ্দেশের লক্ষে। সাদিয়া চিৎকার করে উঠল। 'অ্যাই, শোন—'

ফিরে তাকাল না তরুণ।

নিবিড় অরণ্যের মাঝখানে সেই সরু নদীতে ভাসছে একটা নৌকা। সাদিয়া দেখল, সেই তরুণ একা দাঁড় বেয়ে চলে যাচ্ছে। দূরে—তারপর আরও দূরে। সাদিয়া আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'একটু থাম!'

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। ভেজা শরীরে ছুটতে ছুটতে ও ধরে ফেলল তরুণকে। তরুণ পিছন ফিরে তাকাল।

'মাহমুদ! তুমি!'

মাহমুদ বলল, 'কেন এসেছ, সাদিয়া?'

'তোমার জন্যে।'

'তবে আমাকে ডাকলে না কেন?'

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে রইল সাদিয়া। 'আমি যে ডাকতে ভুলে গেছি, মাহমুদ!'

ঘুম ভেঙে গেল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রাশেদা। সে-দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা না বিরক্তি, রাগ না অনুরাগ, ঘৃণা না স্নেহ, কিছুই বুঝতে পারছে না সাদিয়া। কিন্তু রাশেদার ধৈর্যের প্রশংসা করতে ও বাধ্য। ওকে ঘুম পাড়ানর চেষ্টায় একটানা দেড় ঘন্টা ধরে চেষ্টা করছে সে।

'ভাবী—' অস্ফুট স্বরে বলল সাদিয়া।

'কি হয়েছে, ভাই? কষ্ট হচ্ছে?'

'না।'

'পানি খাবে?'

'উঁহুঁ।'

'ঘুমাও। ঘুমটা ভাল হলে সব কষ্ট সেরে যাবে।'

সাদিয়া করুণ চোখে রাশেদার দিকে তাকাল। 'জানি, ভাবী। কিন্তু ঘুম যে আসছে না। ক্ষণিকের জন্যে চোখের পাতা বুজে আসছে। স্বপ্ন আসছে। তারপর আবার ভেঙে যাচ্ছে ঘুমটা।'

রাশেদার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করে সাদিয়া। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়ে অনেকেরই চরিত্র বদলে যায়। অনেক নরপশুও সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়। হয়ত রাশেদাও ভুল বুঝতে পেরেছে। আজ সে বারবার অসুস্থ আত্মীয়টির মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। চেষ্টা করছে ব্যথার কারণ জানতে। অনেক কসরতের পর নার্সের কাছ থেকে ইঞ্জেকশন পুশ করতে শিখেছে। শিখেছে স্যালাইন দেবার নিয়ম।

একটু আগেই ডাক্তার মাসুদ রাউণ্ড শেষ করেছেন। হাসতে হাসতে রাশেদাকে বলেছেন, 'ভালভাবে ট্রেনিং নিলে আপনি নিজেই ক্লিনিক খুলে বসতে পারবেন, ভাবী। আপনার স্পিরিট আছে। শুধু সত্যিকার স্পিরিটের অভাবেই আমাদের জাতি পিছিয়ে আছে। আর কিছুরই অভাব নেই আমাদের।'

রাশেদা হেসে বলেছে, 'ওসব তত্ত্বকথা আমি বুঝি না, ভাই। আমি শুধু দায়িত্ব পালন করছি। মাহমুদ আমাদের জন্যে অনেক করেছে। ওর বউয়ের এই দুঃসময়ে আমি কি ঘরে বসে থাকতে

পারি?'

ডাক্তার নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেছেন।

রাশেদা সাদিয়ার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'শুধু আজকের রাতটা তোমার কষ্ট হবে। তারপর সব কষ্টের শেষ। তোমার ভাগ্য ভাল, ঠিক সময়মত তোমাকে ক্লিনিকে আনা হয়েছিল।'

সাদিয়া হাসল। 'হয়ত তাই।'

রাশেদা চাপা গলায় বলল, 'আমাদের ওপর তুমি কোন অভিমান পুষে রেখ না, ভাই। জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েই থাকে। পারিবারিক জীবনে এসব মনোমালিন্য, রেষারেষি নতুন কিছু নয়। কিন্তু আজ সব ভুলে যাও। ক্ষমা করে দাও আমাদের।'

সাদিয়ার দু-চোখ অশ্রুতে ভরল। 'কেন ওসব কথা তুলছেন, ভাবী?'

রাশেদা থরথর করে কাঁপতে লাগল। 'এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না, ভাই। আমার জীবনটা···অনেক আগেই···তছনছ হয়ে গেছে।'

'মন খারাপ করবেন না, ভাবী। যা হবার, হয়েছে। আপনি খুব আপসেট হয়ে গেছেন। বিশ্রাম নিন। আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন হালকা হয়ে গেছে। আমার ঘুম আসছে, ভাবী। আমি ঘুমাই···'

রাশেদা ফিসফিস করে বলল, 'ঘুমাও, লক্ষ্মী বোন, ঘুমাও···'

সাদিয়া আবার ঘুমিয়ে পড়ল। দু-চোখে আবার স্বপ্ন এসে ভিড় করেছে। দু-ধারে গাঢ় শ্যামল বন। মাঝখানে সরু নদী। একা একটা ডিঙিতে চড়ে ভাসছে সাদিয়া। কোথাও কেউ নেই।

এক সেকেণ্ডের জন্যে বুঝি আবার ভাঙল ঘুম। রাশেদা সন্তর্পণে স্যালাইনের নলের গায়ে ঝুলন্ত বোতাম ঘোরাচ্ছে। হয়ত স্যালাইন

ডুপের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। সাদিয়ার ছোট ডিঙি ভাসছে···ভেসেই যাচ্ছে···বনের মাঝে উঁকি দিচ্ছে শেয়ালের মুখ। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শেয়ালগুলো। ওরা কি কখনও মানুষ দেখেনি? সাদিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা পরিচিত মুখ। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

রাশেদা ওর কাছে এসে বসল। ওর হাত তুলে নিয়েছে হাতে। ধীরে ধীরে আঙুল বোলাচ্ছে কনুইয়ের কাছে। কেন এত কষ্ট করছে সে? সাদিয়া ভেবে পায় না। ও–তো ভালই ঘুমাচ্ছিল। আবার ঘুম নামছে চোখে। আবার স্বপ্ন। পানি ফুঁড়ে উঠল একটা কুমির। কামড়ে দিল ওর হাতে।

'উফ্!' আর্তনাদ করে উঠল সাদিয়া। রাশেদা সূচ ফুটিয়েছে ওর হাতে। বিড়বিড় করে বলছে সে, 'ঘুমের ওষুধ, সাদিয়া। এখনই গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে তুমি। বিদায়, সাদিয়া। শুভরাত্রি।'

উত্তরে শুভরাত্রি বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে সাদিয়া। তীরের বেগে ছুটছে ওর ডিঙি। মাহমুদ কোথায়? ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল সাদিয়া। কিন্তু বুঝতে পারল, গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না।

আঁকাবাঁকা নদী বেয়ে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে সাদিয়া। দূরের সমুদ্র ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রচণ্ড পিপাসায় ছটফট করতে শুরু করল সাদিয়া। একটু পানি! আহ্! একটু পানি! না, এবারও গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছে না। রাশেদা কয়েক ফুট দূরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সে–দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে ভয়, ঘৃণা, প্রতিহিংসা।

কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা আর বিশ্বাসঘাতকতার কাছে পরাজিত হয়েছে মরহুম জয়েনউদ্দীনের সেই ফুলের মত ফুটফুটে মেয়েটি—যে কখনও একটা

ইঁদুরের গায়েও আঘাত করতে পারেনি। যে ভাবত, পৃথিবীটা বড় সুন্দর, মানুষ সবাই ভাল। কয়েকটি খারাপ প্রবৃত্তির জন্যে মানুষকে দায়ী করা চলে না।

ওই যে···মাত্র ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওর ঘাতিনী। চেয়ে চেয়ে দেখছে ওর কষ্টের মৃত্যু। স্যালাইনের ড্রপ বন্ধ করে দিয়েছে সে। পুশ করেছে কোন এক বিষাক্ত ওষুধ। তার নাম জানে না সাদিয়া। সে শুধু জানে, মৃত্যু এগিয়ে আসছে। চোখে ঘোর ঘনাচ্ছে। ঝাপসা হয়ে আসছে সামনের পৃথিবী। হত্যাকারীর মুখ, স্যালাইনের স্থির, নিষ্কম্প বোতল আর নল, হালকা নীল রঙের দেয়াল, দরজা-জানালার সাদা পর্দা।

এমন অসমাপ্ত জীবন পিছনে ফেলে চলে যেতে হবে, সাদিয়া ভাবেনি। একজন সঙ্গী পেয়েছিল জীবনের চলার পথে, তার সঙ্গ পাওয়া হল না, তাকে সঙ্গ দেয়াও সম্ভব হল না। লোকটি কাল সকালে এসে ওর মৃতদেহ দেখতে পাবে। কি করবে সে? কিভাবে সহ্য করবে? ও যে ভালবাসে!

সাদিয়ার শরীর মোচড় দিয়ে উঠল। নীরবে বলল, 'বিদায়, প্রিয়তম! বিদায়!

রাশেদার আশঙ্কা ছিল, নার্সদের কেউ কেবিনে ঢুকে পড়তে পারে। ওদের কিভাবে সামলাবে, কি বলে ফেরত পাঠাবে, মনে মনে তারই মহড়া দিচ্ছিল। ডাক্তার মাসুদ খেতে বসেছেন একটু আগে। একঘন্টার আগে ওপরে উঠবেন না। তারপর যদি ঘুরতে ঘুরতে একবার আসেন, দেখবেন, তাঁর পেশেন্ট ঘুমাচ্ছে। শান্ত, গভীর ঘুম। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাবেন।

কিন্তু বাইরের বরান্দায় অমন ঝড়ের শব্দ কেন? যেন আট-দশ জন সৈন্য ছুটে আসছে বেপরোয়াভাবে! দরজা খুলে উঁকি দিল রাশেদা। চমকে উঠল মাহমুদ আর রূপাকে দেখে।

'কি ব্যাপার! তো···তোমরা!'

এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিয়ে মাহমুদ কেবিনের ভিতর ঢুকল। রূপা সুইচ টিপে সব আলো জ্বেলে দিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'জন নার্স চিৎকার করে ডাকল ডাক্তার মাসুদকে।

মাহমুদ একটানে সাদিয়ার হাত থেকে টেনে বার করল নীল রঙের সিরিঞ্জ। রূপার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। নেতিয়ে পড়েছে সাদিয়া। ঠোঁটের দু-পাশে সাদা ফেনা বেরিয়েছে।

ছুটতে ছুটতে কেবিনে ঢুকলেন ডাক্তার মাসুদ। 'কি ব্যাপার, মাহমুদ সাহেব?'

মাহমুদ কিছু বলল না। সাদিয়ার দিকে তাকাল। রূপা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ডাক্তার সাহেব, আমার ছোট মা-কে বাঁচান। ওঁকে ইনসুলিন দেয়া হয়েছে···'

ডাক্তার মাসুদ হতভম্ব হয়ে গেলেন। 'এ কি! স্যালাইন বন্ধ কেন?'

দ্রুত বোতাম ওপরের দিকে ঘোরালেন ডাক্তার। স্যালাইনের ড্রপ শুরু হল আবার। সাদিয়ার চোখ, জিভ আর শরীরের তাপ পরীক্ষা করলেন তিনি। পাল্‌স্ বিট মাপলেন। একজন নার্স সাদিয়ার পা ম্যাসাজ করতে শুরু করল। রূপা আঁকড়ে ধরল ওর হাতদুটো।

ডাক্তার অন্য একজন নার্সকে বললেন, 'কোরামিন নিয়ে এস। কুইক!' মাহমুদ কর্কশ স্বরে বলল, 'রাশেদা কোথায়?'

কয়েকজন আয়া আর কর্মচারী ক্লিনিক তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজি

শুরু করল। কোথাও নেই রাশেদা। পালিয়েছে। দাঁতে দাঁত চাপল মাহমুদ। মনে মনে বলল, 'তোমার দৌড় আমি জানি। কোথায় পালাবে তুমি?'

সাদিয়ার কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল মাহমুদ। এখনও বেঁচে আছে ও। হয়ত বেঁচে যাবে। হয়ত বাঁচবে না। কিন্তু ওই অপরাধীকে এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। অফিস রূমে গিয়ে রমনা থানায় টেলিফোন করল মাহমুদ। অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার ইকবাল হোসেনকে পাওয়া গেল।

'কি ব্যাপার! মেয়েকে তো পেয়েছিস! আবার কি চাস?'

মাহমুদ বলল, 'ডাইনীটাকে ধরতে চাই। আমার বউকে খুন করার চেষ্টা করে পালিয়েছে। ওর প্রেমিকের বাসার ঠিকানাটা লিখে নে। ও নিশ্চয়ই ওখানে যাবে।'

'বেশ।' ঠিকানা লিখল ইকবাল।

'আর একটা কাজ করতে হবে, দোস্ত।'

'বল।'

'ক্লিনিকে একটা তদন্ত হওয়া দরকার!'

'কিন্তু তার আগে একটা অভিযোগ তো দরকার!'

'অভিযোগ আমি লিখে রাখছি। তোর লোকজন এসে ওটা রেকর্ড করে নেবে। আমি অনেক অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করেছি, দোস্ত। এবার ডাইনীটার শিক্ষা হওয়া দরকার।'

'ঠিক আছে, দোস্ত।'

এক ঘন্টা পর চোখ মেলল সাদিয়া। ওর অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে মাহমুদের বুকের ভিতরটা হুহু করে ওঠে।

'তুমি কিছু টের পাওনি?'

সাদিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর ওর চোখ জলে ভরল। অনেক কিছু বলতে চায় ও। কিন্তু কিছুতেই শক্তি ফিরে পাচ্ছে না।

ইঙ্গিতে মাহমুদকে কাছে ডাকল সাদিয়া। মাহমুদ ওর কাছে বসল। সাদিয়া ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর চোখ বুজল। ডাক্তার উজ্জ্বল আলোগুলো নিবিয়ে দিয়ে রূপার দিকে ফিরলেন।

'চল, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'ছোট আব্বা এখানে থাকবে?'

ডাক্তার মাসুদ বললেন, 'হ্যাঁ। আজ পেশেন্টকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখতে হবে।'

রূপাকে ধানমণ্ডিতে পৌঁছে ডাক্তার মাসুদ ফিরে এলেন রাত বারোটার দিকে। অফিস রূমে ঢুকে শুনলেন টেলিফোন বাজছে। গভীর রাতে টেলিফোন বেজে উঠলে শুধুই মনে হয়, দুঃসংবাদ আসছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যেন।

'হ্যালো! ডক্টর মাসুদ বলছি।'

'থানা থেকে এ.সি. ইকবাল বলছি। মাহমুদ কি এখনও আপনার ক্লিনিকে আছে? ওকে একটা খবর জানাতে চাই।'

'বলুন।'

ভয়ে, উত্তেজনায় রাশেদার সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। বুঝতে একটুও দেরি হয়নি, ইনসুলিনের ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে রূপা আর মাহমুদ। কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকছে না, ওরা জানল কিভাবে? জব্বার কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এ-ব্যাপারে। এর সঙ্গে সবচেয়ে

বেশি স্বার্থ জড়িয়ে আছে আব্দুল জব্বারের। অন্য কেউ কিছু জানে না। কে এমন সর্বনাশ করল? কিভাবে?

ওয়্যারলেসের গেট পর্যন্ত চলে এল রাশেদা। একটা বেবিট্যাকসি থামাল। তারপর কলেমা পড়তে পড়তে পৌঁছল গেণ্ডারিয়া—আব্দুল জব্বারের বাড়ির সামনে। হঠাৎ লক্ষ করল, সঙ্গে টাকা নেই। তাড়াহুড়ার মধ্যে ব্যাগটা ফেলে এসেছে সাদিয়ার কেবিনে। ভয়ানক আফসোস হল। কয়েক হাজার টাকা আছে ওই ব্যাগের ভিতর। একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। রাশেদা কি করবে, ভেবে পায় না। বেবিট্যাকসি চালককে একটু অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল রাশেদা।

আব্দুল জব্বারের কাজের লোক ওর পথ আটকাল। 'কোত্থেকে আসছেন, ম্যাডাম?'

রাশেদা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'জব্বার আছে?'

কাজের লোক ভুরু কুঁচকে বলল, 'আছে, তবে…খুবই ব্যস্ত।'

'ওনাকে বল, রাশেদা ম্যাডাম এসেছেন। খুব জরুরী দরকার।'

লোকটা ঘাড় চুলকে বলল, 'কিন্তু…এখন তো…ওনাকে ডাকা যাবে না। নিষেধ আছে।'

রাশেদা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল যেন। 'ঝামেলা কর না, বিপদে পড়বে। এখনই খবর দাও ওকে। নইলে চেঁচামেচি শুরু করব। দেখতে দেখতে রাস্তার লোক এসে জড়ো হবে।'

লোকটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'ওই ড্রইংরুমে বসেন। আমি চেষ্টা করে দেখি।'

লোকটা প্যাসেজের ডানদিকের দরজা খুলে দিল। তারপর এগিয়ে

গেল প্যাসেজ ধরে। হয়ত বেডরুমের পেছনদিকের জানালায় টোকা দিয়ে সাহেবকে ডাকবে সে। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে রাশেদা সোফায় বসল। তারপর হঠাৎ ওর মনে হল, জবু মিয়া তো এ বাড়িতে একাই থাকে! তবে এত গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করছে কেন? অনেকদিন আগে রাশেদা এ-বাসায় এসেছে। এ-লোক তখন ছিল না। ওকে নিশ্চয়ই চিনতে পারেনি! চিনতে পারার কথাও নয়। পা টিপে টিপে বেরিয়ে প্যাসেজে পৌঁছল রাশেদা। এ-বাড়ির সবকিছু ওর নখদর্পণে। আব্দুল্লাহ বেঁচে থাকতেও গোপনে কয়েকবার এখানে এসেছে সে। একবার এক অপরাধী চক্রের খোঁজে পুলিস ঘিরে ফেলেছিল বাড়িটা। রাশেদা তখন একা ঘুমাচ্ছিল জব্বারের বেডরুমে। জব্বার কিভাবে পালিয়েছিল, সে জানে না। পুলিস ওকে জাগিয়ে জেরা করেছে দু-ঘন্টা ধরে। প্রচুর মিথ্যে কথা বলে সেবারের মত রেহাই পেয়েছিল রাশেদা। আর কখনও আসেনি এখানে।

জব্বারের বেডরুমের দরজায় একটা ভাঙা হাতল আছে। তার নিচের ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভিতরের কিছু অংশ দেখা যায়। সেখানে চোখ রেখে দেখল, এক কিশোরী শাড়ি পাল্টাচ্ছে। বয়সে মেয়েটি রূপার চেয়ে বড় নয়। চেহারাটাও চেনা চেনা লাগছে। পেছন দিকের জানালা খুলে আব্দুল জব্বার কথা বলছে তার পরিচারকের সঙ্গে।

রাশেদার মনে হল, ওর পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে। অন্ধকার নামছে চারদিকে। ও জানত, জব্বার দুর্নীতিপরায়ণ। অনেক অবৈধ আয় তার। কিন্তু লোকটার প্রেমে এমন ভাবেই মজেছিল যে তার চরিত্রের এই ব্যাপারটা কখনও ভেবে দেখেনি। নিজের চোখে না দেখলে হয়ত কখনও বিশ্বাস করত না। নিঃশব্দে ড্রইংরুমে ফিরে এল রাশেদা।

মনে পড়েছে, জব্বার একদিন ওই কিশোরীর ফটো দেখিয়েছে রাশেদাকে। বলেছে, 'জান, মেয়েটি সিনেমায় নামতে চায়।'

ভুরু কুঁচকে রাশেদা বলেছে, 'কি চমৎকার, ফুটফুটে একটা মেয়ে!'

'হ্যাঁ। বুদ্ধিমতী আর পড়াশোনায়ও ভাল। আমি ওকে বলেছি মন দিয়ে পড়াশোনা করে ডিগ্রি নিতে।'

'ভাল পরামর্শ দিয়েছ। একেবারে অভিভাবকের মতই।'

হেসেছে আব্দুল জব্বার। 'যা বলেছ! ও যেন আমার নিজেরই মেয়ে। আমার জীবনটা তো তুমিই ছারখার করে দিয়েছ! নইলে এতদিনে এমন একটা মেয়ে থাকত আমার।'

সান্ত্বনার সুরে রাশেদা বলেছে, 'অতীত নিয়ে মন খারাপ করে আর কি হবে? রূপা—ও তো তোমার মেয়ে! ওকে কাছে টেনে দুঃখ ভুলতে পার না?'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছে আব্দুল জব্বার।

আজ রাশেদার মনে হল, এতদিন ভুলের স্বর্গে বাস করছিল সে। আব্দুল জব্বারের মত দাগী অপরাধীদের মন আর মুখের কথা এক হতে পারে না, এটা বুঝতে পারা উচিত ছিল অনেক আগেই।

একটা হাউজকোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল আব্দুল জব্বার। ড্রইংরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সেদিকে তাকিয়ে রাশেদার চোখ জ্বলে ওঠে। ভণ্ডামীর একটা সীমা থাকা উচিত।

'কি ব্যাপার! তুমি! এমন অসময়ে!'

রাশেদা ভেবেছিল, প্রথমে সে জব্বারের কাছ থেকে বেবিট্যাকসির ভাড়া আদায় করবে। কিন্তু রাগের মাথায় সব ভুলে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'দরজাটা খুলে দাও, আব্দুল জব্বার।'

বিরক্তির সঙ্গে জব্বার বলল, 'কেন?'

'তোমার ঘরে কে ছিল, আমি জানি। লুকিয়ে লাভ নেই।'

হাসল জব্বার। 'তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। ও আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। গ্রামে থাকে। ঢাকায় এসেছে কলেজে ভর্তি হবার জন্যে।'

ঝাঁজাল গলায় রাশেদা বলল, 'অনেক মিথ্যে কথা বলেছ, আব্দুল জব্বার। অনেক ধাপ্পা দিয়েছ। তছনছ করেছ আমার জীবন। আমার মেয়ের জীবনটাও নষ্ট হবার পথে। এবার লাগাম টান। তোমার প্রতারণায় আর ভুলছি না।'

'মানে!'

'এখনও মানে জানতে চাও? ওই মেয়ে তোমার আত্মীয়া নয়, গ্রামেও থাকে না। ওর নাম ছন্দা। অভিনয় করতে চায় তোমার ছবিতে। শিকার পেলে হাতছাড়া করবে—এমন বোকা তুমি নও।'

আব্দুল জব্বার মৃদু হেসে রাশেদার কাঁধে হাত দিল। 'সত্যিই তুমি মেধাবী আর বুদ্ধিমতী। প্রখর স্মরণশক্তি তোমার। এবার বল, অপারেশনের খবর কি? অস্থির হয়ে আছি খবরটা জানার জন্যে।'

দু-হাতে মুখ ঢাকল রাশেদা। 'মহা প্লাবনের চেয়েও ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছি আমি। তাতে আমার সব কূল ভেসে গেছে। সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার!'

'এসব কি বলছ তুমি!'

'সব জানাজানি হয়ে গেছে। রূপা আর মাহমুদ হঠাৎ ছুটে এসে খুলে নিয়েছে ইনসুলিনের সিরিঞ্জ। সাদিয়া বাঁচল, না মরল, জানি না।'

ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল আব্দুল জব্বার। 'কিভাবে জানাজানি হল? কাক-পক্ষীরও তো টের পাবার কথা নয়!'

প্যাসেজে ভারী বুটের শব্দ। দরজা খুলে গেল প্রচণ্ড শব্দে। পুলিসের একজন অফিসার স্টেনগান তাক করল আব্দুল জব্বারের বুকে। তার একজন সহযোগী রাশেদার পাশে দাঁড়াল।

'সব প্রশ্নের উত্তর থানায় গেলে পাবেন। চলুন, জব্বার সাহেব!'

আঁৎকে উঠল জব্বার। 'আপনারা! বাড়ির ভিতর ঢুকলেন কিভাবে?'

অফিসার বলল, 'মাফ করবেন, আব্দুল জব্বার সাহেব। আমরা আসলে ওই মহিলাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। আপনার বাসার সামনে একজন বেবিট্যাকসিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। আপনার কাজের লোক একটা বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওর সঙ্গে তর্ক করছিল। সে চায় তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে ওই বেবিট্যাকসিতে উঠিয়ে ভাগিয়ে দিতে। বেবিট্যাকসিওয়ালার প্যাসেঞ্জার বাড়ির ভিতরে গেছে, ভাড়া না নিয়ে সে যাবে না। আমরা বেবিট্যাকসিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার প্যাসেঞ্জার কেমন দেখতে, কোত্থেকে আসছে। বেবিট্যাকসিওয়ালার বর্ণনার সঙ্গে আমাদের সব তথ্য মিলে গেল। তা···এমন সময় ধৈর্য ধারণ করা বেশ কঠিন, আব্দুল জব্বার সাহেব। ঠিক বলিনি? তাই অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়লাম।'

'কিন্তু···আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি, জানতে পারি?'

'আপনি কিছুই জানেন না, এমন ভান করবেন না, প্লিজ। মিসেস রাশেদা খানের বিরুদ্ধে একটা "অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডারের" অভিযোগ আছে। আপনি তাকে সাহায্য করেছেন।'

চেঁচিয়ে উঠল আব্দুল জব্বার। 'মিথ্যে কথা! আমি কিছুই জানি না। অন্যায়ভাবে আমাকে ফাঁসান হয়েছে।'

খিল খিল করে হাসল রাশেদা। অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে হাসিটা।

'তুমি কিছুই জান না, আব্দুল জব্বার? একথা বলতে পারলে? ওষুধটা তুমিই আমাকে যোগাড় করে দিয়েছ। বুদ্ধিটাও তোমারই!'

আব্দুল জব্বার বলল, 'ওর মাথার ঠিক নেই, অফিসার সাহেব। নিজেকে বাঁচানর জন্যে ও আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়। এটাই স্বাভাবিক।'

অফিসার বলল, 'আপনিও নিজেকে বাঁচাতে চাইবেন, এটাও স্বাভাবিক। সে-সুযোগ অবশ্য আপনারা যথেষ্ট পাবেন। আদালতে সবাই আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ভোগ করে। তবে আপনি যে ইনসুলেন কিনেছিলেন, তার দ'জন সাক্ষী আছে। কেউ মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে বলে মনে হয় না। তাদের নাম শুনলে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন।'

'যেমন—?'

'যেমন রূপা আর পার্কভিউ মেডিকেল হলের কর্মচারী।'

আব্দুল জব্বার থরথর করে কাঁপতে লাগল।

অফিসার ঠাট্টা করে বলল, 'ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। এখানে কাঁপছেন কেন, আব্দুল জব্বার সাহেব? বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। থানার হাজতেও এয়ার কণ্ডিশনার নেই। ওখানে গিয়ে কাঁপবেন, চলুন।'

সপ্তাখানেক পর একসঙ্গে রিলিজ পেল দুজনেই। ক্লিনিক থেকে সাদিয়া আর জেল হাজত থেকে রাশেদা।

জব্বার আর রাশেদা—দুজনের জন্যেই 'বেল মুভ' করা হয়েছিল। আব্দুল জব্বার ওই মামলায় জামিন পেলেও ফেঁসে গেল অন্য মামলায়। পাঁচটা মামলা দায়ের হয়েছে ওর নামে। খুব সহজে ওর নিষ্কৃতি নেই। রাশেদা সবই স্বীকার করেছে। রাজসাক্ষী হয়েছে সে। কেন্দ্রীয়

কারাগারের গেটে ওকে নিতে এসেছিল মাহমুদ।

গাড়ির পেছনের সীটে মাহমুদের পাশে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

'আমার···আমার মেয়েটা এল না?'

মাহমুদ এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'জানি, ও আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। খুব অল্পের জন্যে ও বেঁচে গেছে। ওর জীবনটা আমি ছারখার করতে বসেছিলাম। বিশ্বাস কর, আমাকে যাদু করেছিল ওই শয়তানটা।'

'শয়তান আমাদের সবার মাঝেই আছে, ভাবী। তাকে পরাভূত করে রাখতে পারাটাই মনুষ্যত্ব।'

'সাদিয়া কেমন আছে?'

'ভাল। আজই বাসায় ফিরেছে।'

রাশেদা ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার মুখ দেখতে চাইবে ও?'

মাহমুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'ও একজন মানুষ, ভাবী। মানুষ কখনও কারও ওপর রাগ পুষে রাখতে পারে না। বিশেষ করে যে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিজেকে বদলাতে রাজি থাকে, তার ওপর বেশিদিন রাগ করা যায় না।'

রাশেদা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমার এত অপরাধ সত্ত্বেও তুমি ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছ, মাহমুদ। অনেক কষ্ট করেছ। এবার আমি তোমার দেনা শোধ করব। তোমার বাড়িতে আমার একটু জায়গা দিও। অন্তত মেয়েটা যতদিন না বিয়ের উপযুক্ত হয়···

বাসায় সাদিয়া ওদের অভ্যর্থনা জানাল। রূপা ওর মা'র সঙ্গে দেখা করতে চায়নি; ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল ও। সাদিয়া ওকে টেনে

আনল ড্রইং রূমে। 'আজ আর কোন অভিমান নয়, রূপা।'

অনেক রাতে—সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, তখন শোবার ঘরে মাহমুদের মুখোমুখি হল সাদিয়া। মাহমুদ প্রথমে সাদিয়ার জন্যে বিছানা পরিপাটি করল। তারপর নিজের বিছানা তৈরি করার জন্যে হাত বাড়াল। সে-হাত আঁকড়ে ধরল সাদিয়া।

'বিয়ের সময় তুমি কথা দিয়েছিলে, আমি যদি কোনদিন ডাক দিই, তুমি সাড়া দেবে। আজ আমার নেমন্তন্ন নাও।'

মাহমুদ অনেকদিন পর নিজের বিছানায় বসল। ওর কাঁধে মাথা রাখল সাদিয়া। 'আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না। অনেক কষ্টের পথ পার হয়ে আমি তোমাকে পেয়েছি। কত কষ্ট, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি সব হারাতে বসেছিলাম। তোমাকে পেয়ে সবই ফিরে পেয়েছি। আর কখনও নিঃসঙ্গ হতে চাই না।'

মাহমুদ সাদিয়ার মাথায় আঙুল দিয়ে বিলি কেটে বলল, 'অতীত যদি তোমাকে কখনও দুঃখ দেয়…'

সাদিয়া ওর মুখ চেপে ধরে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝ না। আমি জানতাম না, কিশোর বয়সের আবেগটাই ভালবাসা নয়। অনেক মূল্য দিয়ে আমি ভালবাসা কিনেছি। সে-ভালবাসার স্বাদ পেতে দাও আমাকে। খুব সামান্যই চেয়েছি জীবনের কাছে। পাব না?'

মাহমুদ হাসল। সাদিয়ার চোখে চোখ রাখল। কাঁপছে ওর চোখের তারা। আলো নিবিয়ে দিল মাহমুদ। বাইরে ঝলমল করছে চাঁদ। রূপালি জ্যোছনার মত স্নিগ্ধ, মধুর হয়ে উঠেছে জীবনটা।

—ঃ শেষ ঃ—